বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২১ ▪ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ছাইভস্ম থেকে উঠে আসা ‘গৌরবের বাংলাদেশ’

স্বাধীনতা এবং একাত্তরের মার্চ

স্বাধীনতার অর্থ খোঁজা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী: বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল হয়েছে

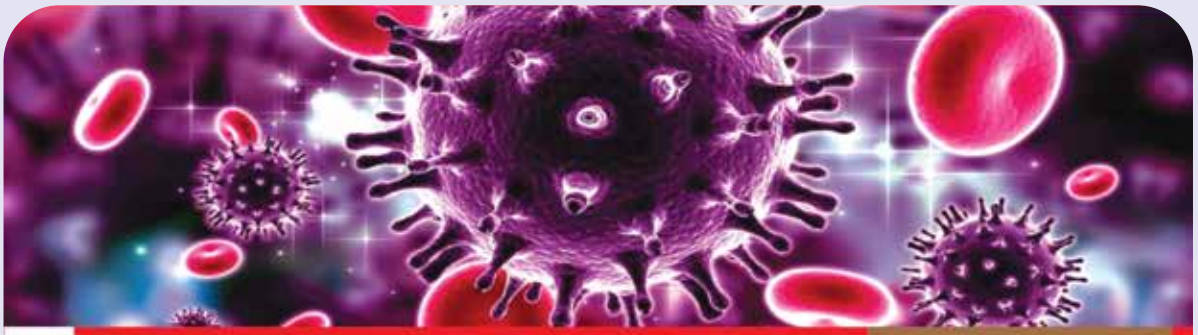

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২১ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ ২০২১ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে মার্চ চিরস্মরণীয় মাস। মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ৭ই মার্চের সেই ভাষণ আজ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ বিসর্জন, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ এবং নির্যাতিত মা-বোনকে।

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার কৃতিত্ব জনগণকে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের এই উত্তরণ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি; সেই সাথে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের জন্য এ উত্তরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা'। প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ এ বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো এ সংখ্যায়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। এছাড়া অন্যান্য নিবন্ধ, কবিতা, নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি।

আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ*-র মার্চ ২০২১ সংখ্যাটি সবারই ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রাপ্তিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য ৪

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

ছাইভস্ম থেকে উঠে আসা 'গৌরবের বাংলাদেশ' ৭
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

স্বাধীনতা এবং একাত্তরের মার্চ ৯
অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান

স্বাধীনতার অর্থ খোঁজা ১২
সেলিনা হোসেন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল হয়েছে ১৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ১৬
প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ১৮
শাফিকুর রাহী

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা ২০
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

বিশ্বের চোখে বঙ্গবন্ধু ২৩
ড. শিহাব শাহরিয়ার

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: পরিপ্রেক্ষিত ও গুরুত্ব ২৬
ড. সুলতানা আক্তার

রংপুরে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা: ঐতিহাসিক মানপত্র ২৯
প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা: ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৩
শহীদুল হক স্বপন

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ৩৬
সাক্ষাৎকার গ্রহণে এম এ খালেক

মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার ও বঙ্গবন্ধুর দর্শন ৩৯
কৃষিবিদ শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

একজন ফায়ার ফাইটার ও একটি বাঁশের সাঁকো ৪১
মিয়াজান কবীর

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক নেতৃত্ব ৪৩
জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী

পল্লিবাংলার রূপকার কবি জসীমউদ্‌দীন ৪৫
দেলওয়ার বিন রশিদ

প্রজন্ম হোক সমতার: সকল নারীর অধিকার ৪৭
সেলিনা আক্তার

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ৪৯
অগ্নিম বিশ্বাস সূর্য

সংগ্রামী নেতা নূরলদীনের প্রেম ৫০
হেলাল হোসেন কবির

হাইলাইটস

গল্প

মুজিবের তর্জনী ৫৬
আফরোজা পারভীন

কবিতাগুচ্ছ ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬২
মাকিদ হায়দার, দুখু বাঙাল, ফারুক নওয়াজ, গোলাম নবী পান্না, আরিফ মঈনুদ্দীন, গোবিন্দলাল সরকার, সোহরাব পাশা, হাসান হাফিজ, সানজীদ নিশান চৌধুরী, গাজী রফিক, জাহানারা জানি, মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন, মো. কামাল শেখ, হাসানাত লোকমান, রোকসানা গুলশান, প্রত্যয় জসীম, খান আসাদুজ্জামান, মুস্তাফিজ শফি, পিয়াস মজিদ, নাহার আহমেদ, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, শিল্পী ভদ্র, আহসানুল হক, সাঈদ তপু, সুস্মিতা বিনতে আলম, এস এম তিতুমীর, অমিত কুমার কুণ্ডু

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৩
প্রধানমন্ত্রী ৬৪
তথ্যমন্ত্রী ৬৫
জাতীয় ঘটনা ৬৫
আন্তর্জাতিক ৬৬
উন্নয়ন ৬৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৭
শিল্প-বাণিজ্য ৬৮
শিক্ষা ৬৮
বিনিয়োগ ৬৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৭০
নারী ৭০
কৃষি ৭১
বিদ্যুৎ ৭২
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৩
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৭৩
নিরাপদ সড়ক ৭৩
স্বাস্থ্যকথা ৭৪
কর্মসংস্থান ৭৫
যোগাযোগ ৭৫
চলচ্চিত্র ৭৬
মাদক প্রতিরোধ ৭৬
সংস্কৃতি ৭৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
প্রতিবন্ধী ৭৮
ক্রীড়া ৭৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি: অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান চলে গেলেন না ফেরার দেশে ৮০

ছাইভস্ম থেকে উঠে আসা ‘গৌরবের বাংলাদেশ’

১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক ঝলমলে দিন। সেদিন বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়েন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি স্বদেশের জন্য উপহার দেন গণমুখী একটি সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন নবীন রাষ্ট্রকে। বাঙালি তাঁর ডাকে সাড়া দেন। ঘরে-বাইরে নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ‘ছাইভস্ম থেকে উঠে আসা ‘গৌরবের বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

স্বাধীনতা এবং একাত্তরের মার্চ

১৯৭১-এর মার্চ বাঙালি জাতির জন্য ‘বেস্ট অব টাইমস’ এবং ‘ওয়ার্স্ট অব টাইমস’। বাঙালির জন্য শ্রেষ্ঠতম সময় এজন্য যে, এই মার্চে এসেই তারা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়াব্যাপী সমবেত কণ্ঠে স্লোগান তুলে আর তারজন্য লাখো লাখো বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মরণপণ জনযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ‘বেস্ট অব টাইমস’ বা শ্রেষ্ঠতর সময় বলেছি। ‘ওয়ার্স্ট অব টাইমস’ এজন্য যে, বাঙালি জীবনে লাখো লাখো মানুষের এমন বিপুল বিনাশ, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন এবং নারীর নজিরবিহীন সম্ভ্রমহানি। এরপর শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ওয়ার্স্ট অব টাইমসকে অতিক্রম করে বেস্ট অব টাইমসে পৌঁছার মরণপণ লড়াই। এ মুক্তিসংগ্রামের জন্য বঙ্গবন্ধু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মোক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে ‘স্বাধীনতা এবং একাত্তরের মার্চ’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৯

স্বাধীনতার অর্থ খোঁজা

স্বাধীনতা একটি ব্যাপক গভীর শব্দ। স্বাধীনতার অর্থ শুধু একটি ভূখণ্ড লাভ নয়, স্বাধীনতা জীবনের সমগ্রতা লাভের মৌলিক শর্ত। গণমানুষের বেঁচে থাকার পূর্ণ দাবি মেটানোর মধ্যেই স্বাধীনতার গভীর অর্থ নিহিত। যতকাল দেশ থাকবে, মানুষ থাকবে ততকাল স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জনের সত্য অক্ষয় হয়ে থাকবে জাতির জীবনে। স্বাধীনতা মানে অন্যায় বোধের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া থেকে মানব মুক্তি। এ নিয়ে ‘স্বাধীনতার অর্থ খোঁজা’ শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১২

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল হয়েছে

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্ব থেকে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালে অসহযোগের মধ্যে ৭ই মার্চ স্বাধীনতার জন্য যা করণীয়-তার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পঞ্চাশটি বছর অতিবাহিত করলাম। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘে চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এ নিয়ে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী/বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল হয়েছে’ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : **রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ গণভবন প্রান্তে 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ' জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। গণভবন প্রান্তে এ সময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রাপ্তিতে

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম।

করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে প্রায় এক বছর পর আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তবুও সরাসরি নয়; ভার্চুয়ালি। আজ অবশ্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বাংলাদেশের একটি মহৎ এবং গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য।

বাংলাদেশ গতকাল স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছি।

সমগ্র জাতির জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আমাদের এই উত্তরণ এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি; আমরা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের দ্বারপ্রান্তে।

বাংলাদেশের জন্য এ উত্তরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে টেনে তুলে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে তাঁরই হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করলো।

এ কৃতিত্ব এ দেশের আপামর জনসাধারণের। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এই মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছি। এই শুভ মুহূর্তে আমি দেশ ও দেশের বাইরে অবস্থানরত বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতির পিতার কন্যা হিসেবে, জনগণের একজন নগণ্য সেবক হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি এই অর্জনকে উৎসর্গ করছি আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মকে। যারা আজকের বাংলাদেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। এ ভাষা আন্দোলনের মাসে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান ভাষা শহিদদের।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল ও দশ বছরের শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, চাচা শেখ আবু নাসের-সহ সেই রাতের সকল শহিদদের।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববঙ্গ শুধু অবহেলিতই ছিল না, এখানকার সম্পদ নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছিল। শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের জন্য ব্যয় করা হতো ২৫-৩০ ভাগ সম্পদ। আর পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ শতাংশ জনগণের জন্য ৭০-৭৫ ভাগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই বৈষম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। শুরু করেন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কিন্তু পাকিস্তানি জান্তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশের সব

অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে যায়। রাস্তাঘাট নেই, রেললাইন-ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত, সমুদ্রবন্দর-নদীবন্দর অচল, কলকারখানা বন্ধ, অফিস-আদালত ধ্বংস। একটা প্রদেশের প্রশাসনকে তিনি অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী করে একেবারে শূন্য হাতে দেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। ভারত থেকে ফিরে আসা এক কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হয়ে পড়া প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষকে পুনর্বাসন করেন। শহিদ পরিবার, নির্যাতিত পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা, ঘরবাড়ি হারানো সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করে। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করে।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীরা তাঁকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যার মাধ্যমে শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই ধ্বংস করেনি, তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়। এর প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর একুশ বছরে।

তখন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বন্যা-খরা, দুর্যোগ, ভিক্ষুকের দেশ হিসেবে। বার্ষিক বাজেটের একটা বড় অংশ আসত বিদেশি সাহায্য থেকে। খাদ্যের জন্য বিদেশি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলো।

গ্রামগুলো ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। গ্রামের মানুষের দিকে তাকানোর কেউ ছিল না। যোগাযোগের জন্য রাস্তা ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না, মানুষের হাতে কাজ ছিল না। অনাহারে, অর্ধাহারে মানুষ দিন পার করত। সারাদিন মজুরি খেটে ২ সের চালও জুটতো না।

৬ বছর নির্বাসিত জীবন শেষে ১৯৮১ সালে দেশে আসার পর আমি ব্যাপকভাবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা সফর করি। আমি সে সময়ই প্রতিজ্ঞা করি যদি কোনোদিন আল্লাহ আমাকে সুযোগ দেন দেশ পরিচালনার, তাহলে গ্রামোন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। গ্রামের মানুষের উন্নয়নে কিছু করব। তখন ৭০-৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করত। আমার মনে হয়েছিল এদের যদি দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারি, তাহলেই বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

১৯৯৬ সালে জনগণের রায় নিয়ে আমি প্রথমবার সরকার গঠন করে আমার চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নতুন নতুন পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় নিয়ে এসেছি। কৃষি উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলাম।

মাঝখানে ৫ বছর বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় ছিল। তারা কী করেছিল আপনারা জানেন। ২০০৯ সালে দায়িত্ব নিয়ে আমরা অব্যাহতভাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আজকের যে অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, তা আমাদের বিগত ১২ বছরের নিরলস পরিকল্পনা, পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ফসল। দেশের মানুষই এসব করেছেন। আমরা সরকারে থেকে শুধু নীতি-সহায়তা দিয়ে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছি।

প্রিয় সাংবাদিকগণ,

মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা– এই তিনটি সূচকের ভিত্তিতে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের তিনটি মানদণ্ডই খুব ভালোভাবে পূরণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ পুনরায় সকল মানদণ্ড অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পূরণের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করল।

জাতিসংঘের পর্যালোচনায় ২০১৯ সালে মাথাপিছু আয়ের মানদণ্ড নির্ধারিত ছিল ১ হাজার ২২২ মার্কিন ডলার। ঐ বছর বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৮২৭ ডলার। আর বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ ডলার। অর্থাৎ মানদণ্ডের প্রায় ১.৭ গুণ। মানবসম্পদ সূচকে নির্ধারিত মানদণ্ড ৬৬-এর বিপরীতে বাংলাদেশের অর্জন ৭৫.৪। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকে উত্তরণের জন্য মানদণ্ড নির্ধারিত ছিল ৩২ বা তার কম। কিন্তু ঐ সময়ে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৭।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতামুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

এক যুগ আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। আজকের বাংলাদেশ এক বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আর্থিক এবং অন্যান্য সূচকগুলির দিকে লক্ষ্য করুন। ২০০৮-২০০৯ বছরে জিডিপি'র আকার ছিল মাত্র ১০৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০২০ সালে তা ৩৩০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই ১২ বছরে সরকারি ব্যয় ৪.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭ হাজার ৯৬০ কোটি থেকে ২০১৯-২০২০ বছরে ৪ লাখ ১৫ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ বছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫.৫৭ বিলিয়ন ডলার। আর ২০১৮-২০১৯ বছরে তা ৪০ দশমিক পাঁচ-চার বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮-২০০৯ বছরের ৭ দশমিক চার-সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪৪ দশমিক শূন্য-তিন বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০০১ সালে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ এবং হত-দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০.৫ ভাগ এবং হত-দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশে।

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৩য় এবং মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

২০০৯-২০১০ বছরে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল মাত্র ৫,২৭১ মেগাওয়াট। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

মানুষের গড় আয়ু ২০০৯-২০১০ বছরের ৬৯ দশমিক ছয়-এক বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। ২০০৯-২০১০ বছরের তুলনায় ৫-বছর বয়সির শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ২৮। মাতৃমৃত্যুর হার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ উপলক্ষে তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি বক্তৃতা করেন। গণভবন প্রান্তে এ সময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

কমে দাঁড়িয়েছে লাখে ১৬৫ জনে যা ২০০৯-২০১০-এ ছিল ২৮০ জন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট'-এর সুবিধা কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল গৃহহীনদের ঘর প্রদান কর্মসূচির আওতায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার গৃহহীনকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ৫০ হাজার গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৩৪৬ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি খাতে চলতি বাজেটে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা বাজেটের ১৬ দশমিক আট-তিন শতাংশ এবং জিডিপির ৩ দশমিক শূন্য-এক শতাংশ। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

করোনাকালে মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন, অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী, নন-এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে-মাদ্রাসার শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় আড়াই কোটি মানুষকে নগদ ও অন্যান্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের নারীরা আজ স্বাবলম্বী। জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ৭ম।

করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে ২০২০ সাল শুধু আমাদের জন্য নয় গোটা বিশ্বের জন্য ছিল সঙ্কটময়। এ মহামারিতে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি। আমরা ইতোমধ্যে টিকা প্রদান শুরু করেছি। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৮ লাখ ৫০ হাজার ৯৪০ জনকে প্রথম ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে এখন পর্যন্ত আমরা ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা মোট জিডিপি'র ৪.৪৪ শতাংশ।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নেবে। আমাদের এ অর্জনকে সুসংহত এবং টেকসই করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ধাপ।

ইতোমধ্যে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এগুলোর কতগুলো এ বছর বা আগামী বছরের শুরুতে চালু হবে।

এছাড়া সারা দেশে একশত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দুই ডজনের বেশি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থান তৈরিসহ আমাদের অর্থনীতিতে আরও গতি সঞ্চার হবে।

বাঙালি বীরের জাতি। মাত্র নয় মাসে আমরা আমাদের স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, দলমত নির্বিশেষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ছাইভস্ম থেকে উঠে আসা ‘গৌরবের বাংলাদেশ’

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি জয়ী হয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈনিকরা আত্মসমর্পণ করলেও বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশ কীভাবে নতুন করে জেগে উঠবে এ নিয়ে ছিল নানা সংশয়। কারণ সারা দেশে তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অস্ত্র। রাস্তাঘাট ধ্বংস। হাজার হাজার বাড়িঘর পুড়ে ছাড়খার। ভারতের মাটিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। সর্বত্রই তাই নানা অনিশ্চয়তা। এমনই এক অস্বাভাবিক সময়ে অন্ধকার থেকে আলোর বার্তা নিয়ে তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে পা রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক ঝলমলে দিন। সেদিন বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে নেমেই বলেছিলেন, তিনি বাংলাদেশকে ‘শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির’ দেশে পরিণত করবেন। ঢাকায় নেমেই চলে যান রেসকোর্স ময়দানে। তাঁকে স্বাগত জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি কাঁদছিলেন। পুরো জাতিও কাঁদছিল। সংগ্রামী বাঙালির আত্মত্যাগে তিনি ছিলেন বিস্মিত। অন্তরের গভীরতম উৎস থেকে বলেছিলেন যে, এ স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খেতে পারে। যে তরুণরা অকাতরে দেশ স্বাধীন করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থান না করলে এই স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে’। তাই এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়েন। এক কোটির মতো শরণার্থীকে পুনর্বাসন, কয়েক লক্ষ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ, সকল ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ, কৃষি ও শিল্পকে একইসঙ্গে পুনর্গঠন করে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি স্বদেশের জন্য উপহার দেন গণমুখী একটি সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। তৈরি করেন কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন নবীন রাষ্ট্রকে। জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পথ দেখান কী করে বিশ্বকে পরমাণু-যুদ্ধমুক্ত শান্তিময় করা যায়। বাঙালি তাঁর ডাকে সাড়াও দেন। ঘরে-বাইরে নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন জোর কদমে।

বাহাত্তরে যখন তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তখন আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলার (যা আজ ৩৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি)। এক ডলারও নেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। দারিদ্র্য শতকরা আশি ভাগ। জীবনের গড় আয়ু ৪৭ বছর (আজ তা ৭৩ বছর)। সক্ষম দম্পতি-প্রতি সন্তান ৬ জনেরও বেশি (আজ গড় ২.১)। মূল্যস্ফীতি ৬৫%। খাদ্য ঘাটতি চরমে। মাথাপিছু আয় ৯৩ ডলার। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি সেই মাথাপিছু আয়কে টেনে ২৭৩ ডলারে উন্নীত করেছিলেন। নানা সংকট সত্ত্বেও দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসছিল। খাদ্য ঘাটতি কমে আসছিল। মূল্যস্ফীতি কমে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এসেছিল। প্রকৃতি বিরূপ। যুক্তরাষ্ট্র বিরূপ। তবুও এগিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। হঠাৎ বজ্রপতন। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীরা ছিনিয়ে নিল আমাদের সবচেয়ে বড়ো স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুকে। এরপর বাংলাদেশ চলতে থাকে প্রগতির উলটো দিকে।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মননে ও চিন্তায় সব সময়ই ছিলেন, আছেন। তাই বহু বাধা ডিঙিয়ে এগুনোর যে মানসিকতা তিনি এ জাতির মধ্যে তৈরি করেছিলেন তার কল্যাণেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। আর তার ফলে ১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফিরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গবন্ধুকন্যা তাঁর পিতার দেখানো পথে দেশকে এগিয়ে নিতে শুরু করেন।

২০০১-এ ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতায় আবারো এ অভিযাত্রায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু আবারো জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করে ক্ষমতায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধুকন্যা ১২ বছর আগে। আর তারপর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতি তো যেন কল্পনাকেও হার মানিয়েছে! ১৯৭৫-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ৭ গুণেরও বেশি বেড়ে ২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬৬,৮৮৮ টাকায়। ১৯৯০-পরবর্তী কালে মাথাপিছু আয় আগের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুত বেড়েছে ঠিকই, তবে বিশেষ করে বিগত ১০-১২ বছরে এক্ষেত্রে নাটকীয় গতি এসেছে। তাই ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে তার ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক দশকে। একই কথা প্রযোজ্য প্রবৃদ্ধির হারের

ক্ষেত্রেও। গত এক দশকে জিডিপি গড়ে ৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। অথচ আগের দুই দশকের গড় প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ।

এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই জিডিপিতে কৃষির অবদান কমেছে আর সে স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করেছে শিল্প খাত। এ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমতে কমতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আর সেই ফাঁকা স্থান প্রধানত পূরণ করেছে শিল্প খাত। ফলস্বরূপ জিডিপিতে শিল্পের অবদান এ সময়ে ১৭.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। তবে উল্লেখ্য যে, জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে এলেও কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। স্বাধীনতার পর পর আমরা বছরে গড়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছিলাম। আর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আমাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। খাদ্য উৎপাদন সূচকের বিচারে আমরা পেছনে ফেলতে পেরেছি ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশকেও। তবে কৃষি উৎপাদনের এমন নাটকীয় বৃদ্ধির পরও কিন্তু কৃষি মজুরি কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলে কৃষির পাশাপাশি বিকাশ ঘটেছে অ-কৃষি খাতেরও। গ্রামীণ আয়ের বড়ো অংশটিই এখন আসছে অ-কৃষি খাত থেকে। দেশের গ্রামাঞ্চল এক দিকে বর্ধিষ্ণু শিল্প ও সেবা খাতের কাঁচামাল ও মূল্য সংযোজিত পণ্য/সেবা সরবরাহ করছে, অন্য দিকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন ভোক্তা হিসেবে তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মোট কথা, গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি বড়ো মাত্রায় স্বনির্ভরতা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশের ফলে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার হয়েছে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। সেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ধারাবাহিক উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। আমাদের জিডিপির আকার বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে। তবে তারচেয়েও বেগবান রয়েছে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির ধারা। তাই ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে যে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ছিল ২৬.৩ তা ২০১৮-২০১৯-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৬-এ। এ সময়ে জিডিপির শতাংশ হিসাবে সরকারি বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭ থেকে ৮.১৭। আর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ থেকে ২৩.৪ শতাংশ।

কৃষি ও শিল্প খাতের ধারাবাহিক বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০১৮-২০১৯-এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। অর্থাৎ এ সময়ে ১০০ গুণেরও বেশি রপ্তানি আয় বেড়েছে। ২০০৭-২০০৮ থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানিতে এক ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭৩-১৯৭৪ থেকে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ৬৬ শতাংশই হয়েছে ২০০৭-২০০৮ পরবর্তী কালে। প্রধানত আরএমজি-নির্ভর রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অন্য যে বিষয়টি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে প্রধানতম ভূমিকা রেখেছে তাহলো ধারাবাহিক এবং দ্রুত গতিতে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি। ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার, আর তারা বছরে গড়ে ৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে পাঠাতেন। ২০১৮-২০১৯-এর হিসাব বলছে, বিদেশে কর্মরত আছেন প্রায় ৭ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিক আর ঐ বছর তারা দেশে পাঠিয়েছেন ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এসবের পাশাপাশি, গত ১০-১২ বছরে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে সেটিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একইসঙ্গে বেগবান করেছে এবং এর ঝুঁকি সহনক্ষমতা বাড়িয়েছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সামাজিক পিরামিডের একেবারে পাটাতনে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য। নীতি-নির্ধারকরা এদিকটিতে মনোনিবেশ করেছেন বলেই অতি-ধনীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য কিছুটা বাড়লেও ভোগ বৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ছিল প্রায় ৪৯ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্য হার ছিল ৩৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখা গেছে বলেই দুই দশকের মধ্যে দারিদ্র্য হার অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে ২২ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্য হার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমিয়ে ১১ শতাংশে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কেবল দারিদ্র্য নিরসনে নয়, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতির সুফল হিসেবে বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ অনেক নন-এলডিসি দেশকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতির প্রধানতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে– দারিদ্র্য হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার এবং স্বাস্থ্য সেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধিকে।

বাংলাদেশ তার দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সর্বশেষ এই করোনা মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মোকাবিলার ক্ষেত্রে। প্রাথমিকভাবে, এই অবিস্মরণীয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলাদেশকেও আর সব দেশের মতো হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে অচিরেই সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত পেশাজীবীদের দক্ষতার গুণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর অতি সম্প্রতি তো কোভিড টিকা দেওয়ার কর্মসূচিও শুরু হয়েছে জোরেশোরে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের দীর্ঘ সফলতার রেকর্ড এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকসহ সকল মহলকে আশা দেখাচ্ছে। মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে বাজারে তারল্যের সরবরাহ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আর বাংলাদেশের দেশি-বিদেশি দায় পরিশোধের সক্ষমতাও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে (দেশি-বিদেশি মোট দায় জিডিপির ৩৫ শতাংশের আশপাশে)। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ন্ত। এসব কারণেই গেল ডিসেম্বরে (২০২০) ব্লুমবার্গ তার কোভিড রেজিলিয়েন্স ইনডেক্সের বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের একটি হিসেবে রেখেছে বাংলাদেশকে।

স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন– 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। আসলেই বাংলাদেশকে 'দাবিয়ে রাখা' যায়নি। আর মাথানত না করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলার এ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। তিনি এদেশের মানুষের মধ্যে যে লড়াকু মনোবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কালে বাংলাদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

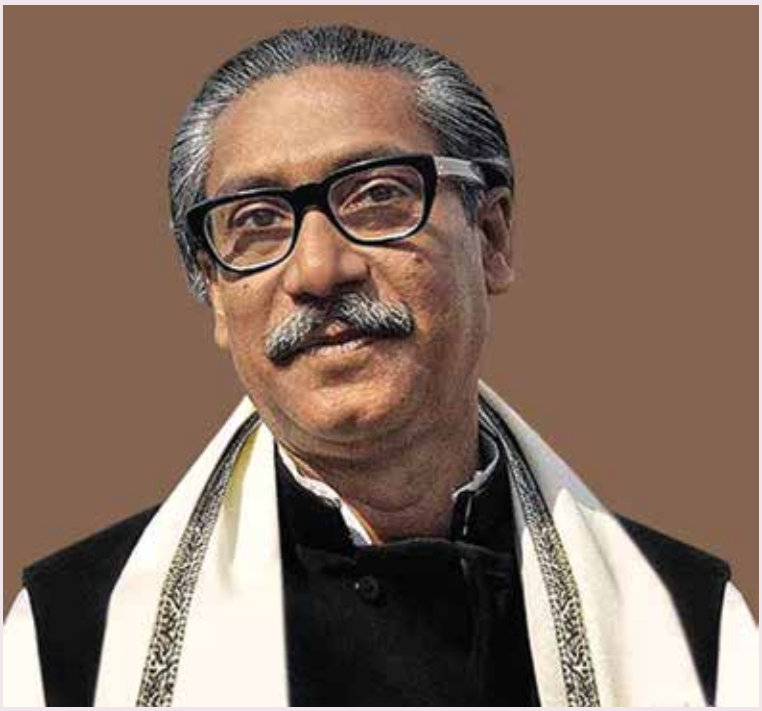

স্বাধীনতা এবং একাত্তরের মার্চ

অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান

১৯৭১-এর মার্চ বাঙালি জাতির জন্য 'বেস্ট অব টাইমস' এবং 'ওয়ার্স্ট অব টাইমস'। একই সময় একইসঙ্গে শ্রেষ্ঠতম সময় এবং নিকৃষ্টতম সময় কীভাবে হয় সে প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু বাস্তব সাদাকালোর মধ্যেই সুপ্ত থাকে বলেই সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। একাত্তরের মার্চ বাঙালি জীবনে তেমনি এক সময়। কবির এই অসামান্য উক্তি শুধু পূর্ব বাংলার বাঙালি নয়, পশ্চিম বাংলার বাঙালির জন্যও সমান সত্যে পরিণত হয়েছিল ১৯৭১-এর মার্চে। সেদিক দিয়ে দেখলে একাত্তরের মার্চ, গোটা বাঙালি জাতির জন্য ফাইনেস্ট আওয়ারও– যাকে বলে সুন্দরতম সময়। পূর্ব বাংলার বাঙালির জন্য শ্রেষ্ঠতম সময় এজন্য যে, এই মার্চে এসেই তারা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়াব্যাপী সমবেত কণ্ঠে স্লোগান তুলতে পারে: 'স্বাধীন কর, স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। পূর্ব বাংলার বাঙালি শত শত বছর ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, অসংখ্য আঞ্চলিক কৃষক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে। টিপু পাগলা ঈমান ও নিশানকে এক করে ইংরেজ আমলে শেরপুর-জামালপুর অঞ্চলকে এক-দুই দিনের জন্য মুক্তও করেছে; কিন্তু সে বিজয়কে ধরে রাখতে পারেনি। তেমনি এক লক্ষ্য নিয়ে মাস্টারদা সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারদের চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ। কিন্তু তাতে স্বাধীনতা আসেনি।

শৌর্য-বীর্য ও দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক হলেও ঐসব অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে বাস্তবসঙ্গত কারণেই। কিন্তু ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন বা কোনো অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে নয়, বাংলাদেশের সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সমগ্র জনগণ এক কণ্ঠে বলে উঠেছে: 'স্বাধীন কর, স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়, মুক্তিবাহিনী গঠন কর। ভুট্টোর মুখে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' বাংলাদেশের সব মানুষের ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যে এ ধরনের স্লোগান আর তারজন্য লাখো লাখো বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মরণপণ জনযুদ্ধের প্রস্তুতি বাংলার রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে একেবারেই নজিরবিহীন। তাই আমরা একেই আমাদের 'বেস্ট অব টাইমস' বা শ্রেষ্ঠতর সময় বলেছি। কিন্তু একইসঙ্গে 'ওয়ার্স্ট অব টাইমস' কেন বলছি ? বলেছি এজন্য যে, বাঙালি জীবনে লাখো লাখো মানুষের এমন বিপুল বিনাশ, নিষ্ঠুরতম নির্যাতন এবং নারীর নজিরবিহীন সম্ভ্রমহানির ইতিহাসও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ইতিহাসের কোনো খণ্ডে। পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের জন্য ঐ মার্চ শ্রেষ্ঠতম সময় ছিল এজন্য যে, তারা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী স্বভাষী ও প্রায় একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী বিপন্ন, বিপর্যস্ত ও দুঃসময়ের মুখোমুখি ভ্রাতৃপ্রতিম বাঙালির মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন– দিতে পেরেছেন নিজ ঘরে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সহযোগিতা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ এ অঞ্চলের সকল মানুষের ঐক্যও ছিল ইতিহাসে এই প্রথম। এরচেয়ে আনন্দের, তৃপ্তির আর সন্তোষের ব্যাপার আর কী হতে পারে! তাদেরও দুঃসময় এজন্য যে, প্রায় এক কোটি মানুষকে তাদের আশ্রয় দিতে হয়েছে। তবু একে দুঃসময় বলে তারা মনে করেননি। বাংলা ভাষী, বাঙালি সংস্কৃতির অধিকারী প্রতিবেশীদের এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশে তারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় ও মণিপুর রাজ্যের মানুষের এবং ভারত সরকারের অবদান তাই বিরাট। এই ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের চিরদিন স্মরণ করতে হবে।

১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা পেশ করার পর থেকেই তা সাধারণ জনগণকে এমন আকৃষ্ট করে যে, তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে– তিনি হয়ে ওঠেন জনগণের নয়নের মণি এবং বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তান সরকারও এটা লক্ষ করে তাঁর ওপর জেল-জুলুম, নির্যাতন এবং শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চাপিয়ে দেয়। অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো সত্ত্বেও আপোশহীন এই নেতা মাথা নোয়াননি। আসলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালিদের ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিমাতাসুলভ আচরণে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর তাঁর মোহভঙ্গ হয়। এ বিষয়ে লন্ডনের *দৈনিক অবজারভার* পত্রিকার তৎকালীন প্রতিবেদক সিরিল ডান বলেন, ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার আরমানি টোলায় অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভার নেপথ্যে তরুণ শেখ মুজিবের ভূমিকাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর তিন বছর পরে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে গৃহীত আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনার পেছনেও শেখ মুজিবই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। ঐ জনসভা এবং প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ব বাংলার প্রায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছিল।[১]

এখন নতুন নতুন তথ্যাদি সমৃদ্ধ গ্রন্থ বা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে

১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চের মিছিল

তাতে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা-চিন্তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৯৪৮-এর ছাত্রলীগ গঠন এবং প্রথম ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ; ১৯৫২-১৯৫৩ সালের কারা নির্যাতনে থেকেও পরোক্ষভাবে আন্দোলনে মদদ দান, ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে সংসদীয় সংগ্রাম এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের পর কৌশলগত ও পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হওয়ার ইতিহাস এখন ধারাক্রমিকভাবেই অনুসরণ করা যায়।

১৯৫৬ সালে পল্টন ময়দানের জনসভায় এক ভাষণের ইংরেজি অনুবাদে পাচ্ছি এই বক্তব্য:

> For whom do we do politics? For whom have we undergone imprisonment? They voted for us for the good of the state. They pay taxes to the state. The state belongs to the people. Paltan Maidan cannot be a state nor can desert of Sahara or Bay of Bengal. There can be state only in places where there is human habitation. If the people of Bengal die of starvation, we shall kick at politics and give up membership of the legislative assembly and the Parliament. We want to go to jail. We demand Autonomy because there is no alternative to save East Bengal.
>
> বাংলা অনুবাদ: আমরা কাদের জন্য রাজনীতি করি? কাদের জন্য আমরা জেল খেটেছি? রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমাদের ভোট দিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে ট্যাক্স দেয়। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। পল্টন ময়দান, সাহারা মরুভূমি বা বঙ্গোপসাগর রাষ্ট্র নয়। যেখানে মানববসতি আছে সেখানেই শুধু রাষ্ট্র থাকে। যদি বাংলার মানুষ অনাহারে মারা যায় আমরা রাজনীতিকে পদাঘাত করে আইনসভা এবং পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করব। আমরা জেলে যেতে চাই। আমরা স্বায়ত্তশাসন দাবি করছি। পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঁচানো যাবে না।

এই হুমকিতেও পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকেরা কান না দেওয়ায় ১৯৬১ সালের শেষ দিকে ছাত্রলীগ 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক একটি লিফলেট বের করে। এটি সামরিক শাসনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বিলি করা হয় বিশেষ করে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলে। তখন সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এভাবেই ছাত্রলীগের মাধ্যমে তাঁর অনেক ধারণা, চিন্তা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক কর্মসূচি আগেভাগে মানুষের মধ্যে প্রচার করে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতেন। ১৯৬১ সালে বাংলার স্বাধীনতা বিষয়ক সুস্পষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে তিনি একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে দেন। এই নিউক্লিয়াসের সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ এবং শেখ ফজলুল হক মণি। এই নিউক্লিয়াস স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৬২ সাল থেকেই এই নিউক্লিয়াস সুচিন্তিতভাবে কাজ করতে শুরু করে। এদের প্রথম কাজটি ছিল কিছু উপযোগী স্লোগান উদ্ভাবন। বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রথম কটি স্লোগান ছিল: 'জাগো, জাগো, বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা মেঘনা যমুনা'। এ স্লোগান ১৯৬২ সালেই চালু করা হয়। এর পরে পর্যায়ক্রমে আসে 'পিণ্ডি না ঢাকা– ঢাকা, ঢাকা এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান 'জয় বাংলা'। ১৯৭০-এর নির্বাচনে এসব স্লোগান বাংলার মানুষকে জাতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মারকুটে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লড়াকু সৈনিকে পরিণত করে। ১৯৭১-এর মার্চে এসে এসব স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত হয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান সংবলিত স্লোগান: 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'স্বাধীন কর, স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'স্বাধীন বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব', শেখ মুজিব', 'জয় বাংলা'।

উপর্যুক্ত নিউক্লিয়াস ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ তিনটি স্তরে কাজ করে– **এক.** স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কাজের সমন্বয় এবং তার প্রচার; এরা ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করে; এবং ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিস্তৃত ইশতাহার পাঠ করে। ইশতাহারের মূল কথাগুলো নিম্নরূপ:

পূর্ব বাংলার ৫৪ হাজার ৫৭১ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসভূমি হিসেবে সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে–

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে;

২. রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত[২];

৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে;

৪. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক. বাংলাদেশের গ্রাম, মহল্লা, থানা ও মহকুমা শহরে স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন, খ. সকল শ্রেণির মানুষের ঐক্য, গ. গ্রামে ও শ্রমিক এলাকাসহ সর্বত্র মুক্তিবাহিনী গঠন, ঘ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, ঙ. শৃঙ্খলা রক্ষা ও পারস্পরিক সংযোগ। চ. পাকিস্তানি পতাকা সর্বত্র নামিয়ে ফেলতে হবে।

২৩শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডি ৩২নং রোডের নিজ বাড়িতে উচ্ছ্বসিত জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। সামরিক প্রস্তুতিসহ এই সুচিন্তিত ইশতাহারের অংশ বিশেষ মাত্র আমরা তুলে ধরলাম।

দুই. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনকে পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্ব ৩৫টি নিপুণ নীতি-নির্দেশ ঘোষণা। এই নির্দেশের মাধ্যমেই পূর্ব-পাকিস্তান সচিবালয় নয় বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ি থেকে গোটা মার্চ মাসে বাংলাদেশের সরকার প্রশাসন পরিচালনা করা হয় এবং **তিন.** সর্বোচ্চ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে কার্যত (Defacto) স্বাধীনতা ঘোষণা, যথা: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ:

> প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। ... আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। ১৯৭১-এর ঐ দিনে বাংলাদেশের কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। সর্বত্র দেখা গেছে কালো পতাকা এবং পতপত করে উড়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। ঐদিন ভোরে বাংলাদেশে স্বাধীনতার মহানায়ক ও বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর ২৫শে মার্চ শুরু হয় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার পৈশাচিক অধ্যায়। এই কৃষ্ণ অধ্যায়কেই বলা যেতে পারে ওয়ার্স্ট অব টাইমস। এরপর শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ওয়ার্স্ট অব টাইমসকে অতিক্রম করে বেস্ট অব টাইমসে পৌঁছার মরণপণ লড়াই।

অতএব, যারা বলেন বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি না নিয়ে বাঙালিকে এক অসম ও ভয়ংকর যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিলেন তাদের আমাদের 'এক', 'দুই' ও 'তিন' শীর্ষক উপযুক্ত পর্যায়গুলো স্মরণ করতে বলি। বিদ্যমান অবস্থায় এরচেয়ে মোক্ষম এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা আর কী হতে পারত!

তথ্যনির্দেশ

১. *The Observer*, London, 28th March 1971.

২. ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড (Ezra Pound) এ গান সম্পর্কে বলেছিলেন, Tagore has sung Bengal into a nation.

লেখক: প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ, বাংলা একাডেমির সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর

স্বাধীনতার অর্থ খোঁজা

সেলিনা হোসেন

স্বাধীনতা একটি ব্যাপক গভীর শব্দ। স্বাধীনতার অর্থ শুধু একটি ভূখণ্ড লাভ নয়, স্বাধীনতা জীবনের সমগ্রতা লাভের মৌলিক শর্ত। গণমানুষের বেঁচে থাকার পূর্ণ দাবি মেটানোর মধ্যেই স্বাধীনতার গভীর অর্থ নিহিত। একাত্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলাদেশের মানুষকে লক্ষ্য পূরণের প্রত্যাশায় উজ্জীবিত করেছিল। একথা তো সত্য, যতকাল দেশ থাকবে, মানুষ থাকবে ততকাল স্বাধীনতার মতো বড়ো অর্জনের সত্য অক্ষয় হয়ে থাকবে জাতির জীবনে। যুদ্ধ, মৃত্যু, জীবন, রক্ত, শহিদ, শহিদের আত্মদান, অপারেশন, নির্যাতন, মুক্তিযুদ্ধ, বীরাঙ্গনা ইত্যাদি যাবতীয় শব্দরাজি আমাদের প্রিয় স্বদেশের শুধু ভাষার সম্পদ নয় এসব শব্দ আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদান। আমাদের স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবসের দীর্ঘ বয়ান।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ রমনা রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর প্রধানের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান আত্মসমর্পণ করে

এসব শব্দের মধ্যে স্থির হয়ে গেছে এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন। যাদের অভাব-দারিদ্র্য আছে; কিন্তু সে দরিদ্রতা তার সাহসকে ছুঁতে পারে না। তাই তারা মুখ থুবড়ে পড়ার আগে বলতে পেরেছিল, শত্রুর গুলি নিতে হলে সেটা বুকেই নেব– পিঠে নয়। এভাবেই স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত হয়েছে। নিজের দেশের মানুষের দৃঢ়প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই চারপাশে– বিদেশেও শুনেছি নিজ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিদেশি মানুষের সহমর্মিতার কণ্ঠস্বর। তখনই বুঝে যাই স্বাধীনতা মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। অন্যের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে আসে অন্য দেশের অসংখ্য মানুষ। তারা ঐক্যের বন্ধনে মিলিত হয়। সমবেত কণ্ঠে গান গায় যুদ্ধরত যোদ্ধাদের জন্যে। শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দেয় খাদ্য, পোশাক, ওষুধ। স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য দেশে দেশে প্রচার চালায়। দেশ-বিদেশের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধরত মানুষ এমন অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিল।

স্বাধীনতার ২৯ বছর পরে এমন একজন মানুষের দেখা পেয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো শহরে। ২০০০ সালের মে-জুন মাসে সানফ্রানসিসকোতে ছিলাম এক মাসের জন্য আমার মেয়ের প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে। যে হাসপাতালে ছিল তার নাম ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রানসিসকো। সংক্ষেপে ইউসিএস। আমি প্রতিদিন ট্যাক্সি ক্যাবে বাড়ি থেকে হাসপাতালে যেতাম। আবার একটি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতাম। একদিন এক বেশ বয়সি ট্যাক্সি চালক আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আর ইউ ফ্রম ইন্ডিয়া? প্রশ্ন শুনে মন খারাপ করে মনে মনে বললাম, ব্যাটা স্বাধীনতার পরেও বাংলাদেশের নামটা মনে আসে না কেন? ভূগোলের জ্ঞান তার কম মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। আর ড্রাইভারকে বললাম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

তিনি উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বললেন, বাংলাদেশ, ওহ্ বাংলাদেশ! তাঁর উত্তেজনা ও আনন্দে আমি হকচকিয়ে যাই। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে যেভাবে বলছেন, তাতে তার ভূগোলের জ্ঞান নিয়ে একটু আগে যে চিন্তা করেছিলাম, তার জন্য বিব্রতবোধ করলাম। সিগন্যালে গাড়ি থামলে তিনি পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানি। আমার হকচকানো ভাব কাটে না। মৃদুস্বরে বলি, কীভাবে?

হা হা করে হাসেন গাড়ির চালক। আমি তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করি। রেড সিগন্যাল পার হয়ে ট্যাক্সি চালক বলতে থাকেন তার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা। বললেন, একাত্তর সালে আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কন্ট্রিবিউট করেছিলাম।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে করলেন?

বললেন, একাত্তর সালে নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে জর্জ হ্যারিসন আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল গঠনে যে কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন, আমি এই কনসার্টে টিকিট কেটে ঢুকেছিলাম। আমার ঐ কন্ট্রিবিউশনের জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। আমি একাত্তর সালের ঐ ঘটনা মনে রেখেছি। আপনারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন।

আমি তাকে নানাভাবে আমার কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করি। আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। নিজেকে শোনাই নিজেরই কথা, স্বাধীনতা তুমি বিদেশি মানুষের দৃপ্তকণ্ঠের শ্রদ্ধার আসন। স্বাধীনতা তুমি বিদেশি মানুষের সহমর্মিতার রুপালি স্নান।

একসময় হাসপাতালের গেটে পৌঁছে যাই। ব্যাগ থেকে ভাড়ার টাকা গোনার সময়ে তিনি পিছনে ফিরে বললেন, হাউ কুড ইউ কিল শেখ মুজিব? আবার চমকে উঠি। তার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মাথা নিচু করে তার দিকে ভাড়ার টাকা এগিয়ে দেই। তিনি আমাকে ভাঙতি পয়সা ফেরত দেন। আবার জিজ্ঞেস করেন, হাউ কুড ইউ কিল শেখ মুজিব?

ভেতরটা কাঁপছিল আমার। আমি তার দিকে তাকাই না। দরজা

স্বাধীনতার আনন্দ

খুলে দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকে যাই। আমি রিসেপশনে একটু ক্ষণ বসে থাকি। আমার স্মৃতিতে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। আমার চোখের সামনে পুড়তে থাকে স্বাধীনতার স্বপ্ন। বিদেশের সেই হাসপাতালে বসে নিজেকে ভীষণ অচেনা মানুষ মনে হয়েছিল। ভাবতেই পারছিলাম না যে, কত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল নিরপরাধ নারী ও শিশুদের। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের এটি একটি দিক। এর অন্যদিকে ১৯৭৫-এর পরে ২০০০ সালে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। জাতি একটি অন্যায়কে কাঁধে নিয়ে দিন যাপন করছিল। আমাদের সামনে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল। কালো পর্দায় ঢেকে যাচ্ছিল বড়ো আকাশ। রোদ আমাদের শরীর স্পর্শ করতে পারছিল না। মুছে যাচ্ছিল ঘাসের শিশির। এই বোধে আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিলাম।

দৈনিক *সমকাল* 'স্বাধীনতা তুমি' শিরোনামে আয়োজন করেছে সম্পাদকীয় পাতার লেখা। অনেকেই শুধু অনেক বিষয় লিখবেন। লেখা চেয়ে যে চিঠিটা সম্পাদক পাঠিয়েছেন সেখানে বলেছেন, 'স্বাধীনতার নয় মাস শুধু যুদ্ধের ফল নয়, একটি দীর্ঘ ইতিহাসের ফল। স্বাধীনতা ব্যাপক ও বিস্তারিত এ অভিজ্ঞতার নাম... 'বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর নাম।' এই লেখাটি লেখার সময় আমার সেই ট্যাক্সি চালকের কথাই মনে আসে। মনে হয়েছিল সেই মানুষটি আমার স্বাধীনতার চেতনায় প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল। সেদিন ট্যাক্সিক্যাব চালানোর সময় তাকে অসুস্থ দেখেছিলাম। খুকখুক কাশি, সর্দি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ক্লান্ত চেহারা আমার স্মৃতিপটে গেঁথে গিয়েছিল। তাকে আমি সরাতে পারিনি আমার করোটি থেকে। তার পুরো অবয়ব, কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি, গাড়ির স্টিয়ারিং ধরা মুঠি এমনকি প্রশ্ন আমাকে পঁচিশ বছর পরে স্বাধীনতার উজ্জ্বল রন্ধ্রে ফিরিয়ে আনে। আমি ২০০০ সালের পর থেকে একদিনের জন্যও ভুলি না তাকে।

বর্তমানে তাকে সামনে রেখেই লিখতে বসেছি, 'স্বাধীনতা তুমি'...যিনি মুক্তিযুদ্ধের তহবিল গঠনের জন্য কয়েকটি ডলার দিয়ে টিকিট কেটে ছিলেন। কনসার্টটি শোনা মুখ্য ছিল না, মুখ্য ছিল একটি জাতির স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজেকে যুক্ত করা। এই মানুষটিরই তো অধিকার দাঁড়ায় স্বাধীনতার স্থপতিকে হত্যা করা নিয়ে প্রশ্ন করার। তাই নিজেকেই বলতে ইচ্ছা হয় স্বাধীনতা মানে অন্যায় বোধের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া থেকে মানব মুক্তি। স্বাধীনতা মানে ন্যায়বিচার পাওয়ার আনন্দে অভিষিক্ত হওয়া।

সেই বছরেই ন্যায়বিচার পাওয়ার আনন্দে গর্বিত হয়েছে জাতি। ব্যক্তিগতভাবে আমার সেই মানুষটির কথা বারবার মনে হয়েছে, যার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। আর কোনোদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। দেখা হলে বলতাম, হত্যাকাণ্ডের রায় পেয়েছে জাতি। আমরা আবার বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। আমরা বলতে পারছি, স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধার দুরন্ত সাহসের অবিনাশী গান। স্বাধীনতা তুমি যোদ্ধা-নারীর দীপ্ত ধারণায় মানববোধ।

সবশেষে আবার সেই অসাধারণ মানুষটিকে ঘিরে জেগে ওঠে স্মৃতি। কতটুকু সময় দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে? বিশ কিংবা পঁচিশ মিনিট হবে হয়ত; কিন্তু সেটি ছিল অনন্তকালের মতো সময়। এই বিশাল সময় ধরে আমরা বলে যাব আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার কথা। বলতে থাকব নানা ভাবনায়। নানা চেতনায়। যেমন আবারো বলছি, স্বাধীনতা তুমি দেশে-বিদেশের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের অমলিন স্মৃতি।

লেখক: প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক

ধূম্রপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূম্রপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

ঢাকা পুরাতন বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানান

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল হয়েছে

খালেক বিন জয়েনউদদীন

কালের পরিক্রমায় স্বাধীনতার পঞ্চাশটি বছর অতিবাহিত করলাম আমরা। বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা স্বপ্ন সফল করে চলছে। শেখ মুজিব ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ইরাকি দরবেশ শেখ আউয়ালের বংশধর এবং অষ্টম উত্তরপুরুষ।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। ১৭৫৭ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশটিকে বিদেশিরা দখল করে নেয় এবং প্রায় দুইশ বছর শাসন করে। প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, পরে ইংল্যান্ডের রানির অধীনে আমরা শোষিত হই। এ সময় আঞ্চলিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়।

এর মধ্যে ফকির সন্ন্যাস বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯৩-১৮৩৩), ওহাবী-ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩১-১৮৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০) এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৫) প্রতিষ্ঠিত হলে উপমহাদেশ থেকে বিদেশি শাসক ইংরেজদের তাড়ানোর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। এরই মধ্যে চতুর ইংরেজ হিন্দু-মুসলিমদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থামানোর লক্ষ্যে জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি করে আমাদের বাংলা অঞ্চলকে ১৯০৫ সালে ভাগ করে যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎসভূমি ছিল দুই বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তর প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, এলাহাবাদ, লাহোর, ব্যাঙ্গালোরসহ স্বাধীনতাকামী মানুষের নিজ নিজ এলাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উপমহাদেশের নির্যাতিত মানুষের স্বরাজ আন্দোলনের প্রতি ইংরেজদের মনোযোগী হতে দেখা যায়। ১৯৩৫ সালে তারা ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করে এবং স্ব-শাসনের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক নির্বাচনও দেয়। তখনো কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার লড়াই থেমে যায়নি। অবশেষে আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করি দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। বাংলা আবার দ্বিতীয়বার ভাগ হয়। আমাদের পূর্ব বাংলা পাকিস্তান নামক হাজার বারোশ মাইল দূরে থাকা একটি দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত আমরা ইংরেজ তাড়িয়ে পাঞ্জাবিদের উপনিবেশের অধীন হই। এক বছরের মধ্যেই স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। যখন দেখি পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কেড়ে নেওয়ার ফন্দি আটে এবং আক্রমণ চালায়। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের মাতৃভূমি পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করে এবং শোষণ শুরু করে বাঙালিদের রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে। তারা পূর্ব বাংলায় বঙ্গভঙ্গকারীদের উত্তরসূরিদের দিয়ে তাবেদার আঞ্চলিক সরকার বানিয়ে নিপীড়ন চালায়। এ সময় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান রুখে দাঁড়ান। আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তীব্র প্রতিবাদ ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসাম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন একমাত্র গোপালগঞ্জের সেই তরুণ শেখ মুজিব। যাঁর শুরুটা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্বে। এরপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৬ দফার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের বাংলায় গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালে অসহযোগের মধ্যে ৭ই মার্চ স্বাধীনতার জন্য যা করণীয়– তার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নির্দেশে এবং তাঁর নামেই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। মোট কথা, বাংলাদেশের অপর নাম শেখ মুজিব। তাঁরই আন্দোলন ও সংগ্রামের ফসল এই বাংলাদেশ।

তবে এই আন্দোলনে ও সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে ছিল এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ। তাঁর ডাকেই এরা যুদ্ধ করেছেন। শত্রুকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। তাদের আত্মত্যাগ ও জীবনদান বৃথা যায়নি। দখলদার পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় দালাল সৈন্যরা একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। একাত্তরের সেই যুদ্ধে আমাদের প্রধান মিত্র ছিল ভারত, রাশিয়াসহ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষ। শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের দু-একটি রাষ্ট্র। একাত্তরের সেই যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি ত্রিশ লক্ষ প্রাণ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম। মিত্রবাহিনী হারিয়েছে প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী

ইন্দিরা গান্ধীর অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সকল মুক্তিযোদ্ধা, মিত্রযোদ্ধা, ভারত-রাশিয়াসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের বন্ধুদের– যাঁরা সেই দুর্দিনে আমাদের খাদ্য, আশ্রয়, অস্ত্র সমর্থন দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ৫০ বছর হয়ে গেল। আমরা জোর গলায় স্বাধীনতার কারণে কী পেয়েছি, কী অর্জন করেছি– তা বলতে পারি। অবশ্য এই ৫০ বছরের মধ্যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জিতে ২১ বছর কালিমায় লেপা। এসময় একাত্তরের স্বাধীনতার বিশ্বাসী নয়, এমন শক্তি জাতির পিতাকে হত্যা করে এবং তাঁর বংশকে নির্বংশ করে বাংলাদেশটিকে শাসন করেছে হাফ পাকিস্তান বানিয়ে। কিন্তু একাশিতে আমাদের দুঃখ বেদনা উবে যায় বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা স্বদেশ ফেরাতে। স্বাধীনতাকামী মানুষ সম্বিত ফিরে পায়। স্বাধীনতা শত্রুগুলো অন্ধকারে লুকাতে থাকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরলস পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফসল এই স্বাধীনতার ৫০ বছরের প্রাপ্তি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি–

❑ আমরা অর্জন করেছি মাতৃভূমির স্বরাজ স্বাধীনতা। আমরা পেয়েছি একটি নিরাপদ রাষ্ট্রের মর্যাদা, স্বকীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।

❑ দেরিতে হলেও একাত্তরের শত্রুদের ও মানবতাবিরোধী নরঘাতকদের বিচার করেছি, তাদের গলায় ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে।

❑ বিচার করেছি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডের খুনিদের, একাত্তরের চেতনা বিনাশ করেছিল যারা।

❑ আমরা অর্জনের প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর কর্মতৎপরতার কারণে একটি স্বাধীন দেশের সংবিধান পেয়েছিলাম, যা পঁচাত্তর পরবর্তী খুনিরা বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল, আমরা তা উদ্ধার করেছি।

❑ আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসন, ছিটমহল সমাধান ও সমুদ্র বিজয় করেছি।

❑ আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি।

❑ আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন এখন বিশ্বের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বিভূষিত এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ জাতিসংঘের সংরক্ষিত সম্পদ।

❑ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে রাষ্ট্র এবং প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন বা প্রাপ্তি অনেক। নিরাপদ বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান, চিকিৎসা অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ এখন স্বয়ম্ভু। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘে চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। মাথাপিছু আয় অর্থাৎ জিডিপির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঊর্ধ্বগামী। বঙ্গবন্ধু এমন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রিজার্ভ ফান্ড আশাতীত।

❑ কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ৫০ বছরের অর্জন বিশাল। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক। এইস্তরে খাদ্য ও বই বিতরণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

❑ জমির সিলিং নির্ধারণ, কেন্দ্রীয় শহিদমিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, তাবলীগ জামাতের ঢাকা ও টঙ্গির জমি বরাদ্দ, বাস্তুহারাদের জমি বরাদ্দ, শিল্পকলা একাডেমি, সামরিক একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুরই অবদান।

❑ স্বাধীন বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামকে আনা এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতারই সুফল।

❑ দেশে সকল অঞ্চলের সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু সেতু ও পদ্মা সেতু নির্মাণ আমাদের স্বাধীনতার আরো দুটি মাইলফলক। উড়াল সেতু (ট্রেন) ও পাতাল পথ নির্মাণ খুব শিগগিরই শেষ হবে। শেষ হবে কর্ণফুলি টানেল।

❑ একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব প্রদান এবং তাঁদের ভাতা প্রদান এবং সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি বিদেশি রাষ্ট্র ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী বন্ধুদের নাগরিকত্ব প্রদান ও সম্মাননা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে উজ্জ্বল করেছে।

❑ এছাড়া আশ্রয়হীনদের নিরাপদ বাসস্থান, অসহায়দের সকল প্রকার ভাতা প্রদান– স্বাধীনতার সুফল বয়ে এনেছে।

❑ তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রীতির ও সুদৃঢ়।

❑ ১৯৯৬ সালের পর থেকে গণতন্ত্রের অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে, ন্যায়বিচার ভোগ করছে দেশের সকল নাগরিক। আমরা সবাই বাঙালি, কোনো শ্রেণিভেদ নেই।

❑ বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশ কখনো ভেঙে পড়েনি। উপকূলে যথাযথ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং এ বছর বিশ্ব মহামারি করোনায় সরকারি কর্মকাণ্ড– বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে। আর এরই মধ্যে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সীমিত আকারে হলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অশেষ।

❑ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রকৃত ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি জানাতেই সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভ আগমন। আমরা অহংকার করে বলতে পারি মুজিব শতবর্ষ পালনের পাশাপাশি সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন গৌরব বয়ে এনেছে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে।

আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। খাদ্যে স্বনির্ভরতা, রপ্তানি আয়, তথ্যপ্রযুক্তি ও জনশক্তির রেমিটেন্স স্মরণ করিয়ে দেয় স্বাধীনতা অর্জনের সফলতার কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন: দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুও ভাবতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেই অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। আমরা স্বাধীন দেশে সবাই সুখে আছি, শান্তিতে আছি। তবুও আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন করে শপথ নিতে হবে– স্বাধীনতার শত্রুরা যেন পঁচাত্তরের মতো আর ষড়যন্ত্র না করতে পারে। আমরা একাত্তরের প্রহরী, বাংলা মায়ের সৈনিক। জয় বাংলা।

লেখক: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) সারা জীবন বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সকল অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণ-পীড়ন থেকে তাঁদের মুক্ত করা। তিনি কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কল্যাণের কথা যেমন ভেবেছেন, তেমনি বাঙালি নারীর কল্যাণের কথাও চিন্তা করতেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন নারীদের উপেক্ষা করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ম্যানিফেস্টো এবং তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তব্য-বিবৃতিতে।

(ক) বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করতেন। তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষিত মেনিফেস্টোতে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, 'নারী ও পুরুষের মানবিক ও দৈহিক পার্থক্য সাপেক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিভা ও শক্তি অনুসারে জীবনে চরম উন্নতি লাভের জন্য প্রত্যেক নারীকে পূর্ণতম সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। মাতৃমঙ্গল চিকিৎসালয় এবং সেবা-সদন ও শিশু শিক্ষালয়ে (কিন্ডারগার্টেন) মা ও শিশুর খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক চাকুরিয়া নারীকে সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে পূর্ণ বেতনে বিদায় মঞ্জুর করিতে হইবে।'

নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনার আরেকটি উদাহরণ হলো পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ২০টি মহিলা আসন সংরক্ষণের দাবি উত্থাপন করা। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে ১৯৫৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের (গণপরিষদ) অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ২০টি 'মহিলা আসন' সংরক্ষণ করার জন্য দাবি উত্থাপন করেন। তাছাড়া ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন।

(খ) বঙ্গবন্ধুর নারীদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা

১. সাংবিধানিক অধিকার প্রদান

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের সংবিধানে বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেন। যেমন:

> ১৯(১)। সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।
>
> ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।
>
> ২৮(১)। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
>
> ২৮(২)। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।
>
> ইত্যাদি ধারাসমূহ বঙ্গবন্ধুর নারী ক্ষমতায়নের উদাহরণ।

২. আইন প্রণয়ন

বঙ্গবন্ধুর সরকার নারী কল্যাণে নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করেন:

গর্ভপাত আইন, ১৯৭২, The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Act, 1972, The Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation Act 1974 (Act XVI of 1974), মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪) এবং The Bangladesh Girl Guides Association Act, 1973 (Act No. XXXI of 1973).

৩. মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর দালাল-রাজাকারদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ নারী নির্যাতিতা হয়েছিলেন। সেসময় অনেক নারী গর্ভবতী হন। বঙ্গবন্ধু এসব নারী ও যুদ্ধশিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নগরবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তাঁর ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। তিনি অনুরোধ করে বলেন 'নির্যাতিত মা-বোনদের সমাজে টেনে নিন'। বঙ্গবন্ধু এসব নির্যাতিতা মহিলার মাঝ থেকে স্ত্রী পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য আবেদন জানান। (*সংবাদ*, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)

তিনি উক্ত জনসভায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, 'তোমরা বীরাঙ্গনা, তোমরা আমাদের মা'।

৩(ক). ধর্ষিতা নারীদের গর্ভপাত আইন প্রণয়ন

পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের ফলে যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছিলেন তাদের গর্ভপাতকে আইনসম্মত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ধর্ষিতার জন্য 'গর্ভপাত আইন' প্রণয়ন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসকল নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে জানুয়ারি (১৯৭২) থেকে অক্টোবর (১৯৭২) পর্যন্ত এই আইন প্রযোজ্য ছিল।

৩(খ). যুদ্ধশিশু

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধশিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বাংলা পিডিয়ার ৮ম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছিল 'বাংলাদেশের যুদ্ধশিশুদের সংখ্যা দশ হাজারের মতো ছিল। (*বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯-৪৫০)। যুদ্ধশিশুদেরকে যাতে বিদেশে দত্তক হিসেবে পাঠানো যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধু জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল সোশাল সার্ভিসকে অনুরোধ করেছিলেন। বিদেশি নাগরিকেরা যাতে যুদ্ধশিশুদেরকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সরকার ১৯৭২ সালে The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Act প্রণয়ন করে। তার পরে কানাডার দুটি সংগঠন ('মন্ট্রিল ভিত্তিক আন্তঃদেশীয় দত্তক বিষয়ক সংস্থা ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন এবং টরেন্টোভিত্তিক বিশ্বের নির্যাতিত শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত ত্রাণ প্রতিষ্ঠান 'কুয়ান ইন ফাউন্ডেশন') এবং মাদার তেরেসা ও তাঁর সংগঠন 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' যুদ্ধশিশু দত্তক প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক ব্যক্তি যুদ্ধশিশুদের দত্তক হিসেবে নিয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'হোল্ট অ্যাডপশন প্রোগ্রাম ইন্ক এবং টেরি ডেস হোমস– প্রভৃতি সংগঠনও যুদ্ধশিশু গ্রহণ প্রোগ্রামে সংযুক্ত হয়। (বিস্তারিত : *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০)

৩(গ). শিশু পল্লি প্রতিষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধের সময় পিতা-মাতা হারানো এতিম শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার শ্যামলীতে আড়াই কাঠা জমিতে শিশুপল্লি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩(ঘ). বীরাঙ্গনাদের বিবাহের ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে কিছু যুবক বীরাঙ্গনাদের বিয়ে করেছেন (*দৈনিক বাংলা*, ২২-০১-১৯৭২; *দ্য ডেইলি অবজারভার*, ২৯-০৪-১৯৭২)। বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিজ উদ্যোগে ১০ জন বীরাঙ্গনার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় কোনো কোনো বীরাঙ্গনা তাদের বাবার নাম পরিচয় প্রকাশ করতে চাইতেন না। বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিলেন, 'লিখে দাও পিতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান'।

৩(ঙ). ধর্ষিতা নারীদের চিকিৎসা ও পুনর্বসান

নির্যাতিত নারী, মা ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য সারা দেশে ২২টি সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিজি হাসপাতালে আলাদা মহিলা ওয়ার্ড চালু করা হয়। (*দৈনিক পূর্বদেশ*, ৯ই অক্টোবর, ১৯৭২)

৩(চ). নারী পুনর্বাসন-বোর্ড গঠন

বঙ্গবন্ধু দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন বিচারপতি কে. এম. সোবহান। এই বোর্ডটি ছিল স্বায়ত্তশাসিত। এই বোর্ডের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দুটি: (১) নির্যাতিতা নারীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ডাক্তারি সহায়তা প্রদান ছাড়াও নির্যাতিতা, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও গণহত্যার শিকার সকলের মা-বোন ও বিধবাদের সহায়তা করাও বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল। (২) পুনর্বাসন বোর্ডের আওতায় দুস্থ নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সেলাইসহ নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বোর্ডের উদ্যোগে ঢাকার বেইলি রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় উইমেনস ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

৩(ছ). নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

নারী কল্যাণমূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭২ সালে গঠিত 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড'কে ১৯৭৪ সাল 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' নামকরণ করা হয়।

৪. বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গঠন

পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অল পাকিস্তান উইমেন অ্যাসোসিয়েশন' (আপওয়া) ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলা সমিতি ১৯৭২ সালের ৮ই মার্চ নারী দিবস হিসেবে পালন করে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের নারী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এভাবে বৈশ্বিক নারী উন্নয়ন আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের নারী সমাজ যুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে মহিলা উন্নয়নের অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' প্রতিষ্ঠার সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করেন, যা গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে।

৫. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জনসংখ্যা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে কমতে থাকে (১৯৭৪ সালের ২.৪৮ থেকে ১৯৮১ সালে হয় ২.৩৫)।

৬. নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২৪,৬০০ নারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য ধার্য করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গঠিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে শিশু পালন, খাদ্য ও পুষ্টি, রোগী সেবা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ পেশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার ফলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৭২-এর তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। নারী উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে নারীদের জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মেয়েদের শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে The Bangladesh Girl Guides Association Act প্রণয়ন করা হয়।

৭. নারীর কর্মসংস্থান, বাসস্থান ও পরিবহণ সমস্যার সমাধান

নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ চাকরি কোটা রাখার নির্দেশ দেন। মুক্তিযুদ্ধে যে সকল নারী তাদের স্বামী বা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েছেন তাদের এই পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগ্য নারীদের চাকরিতে সমান সুযোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। কর্মজীবী নারীদের বাসস্থান ও পরিবহণ সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৮. নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ড. নীলিমা ইব্রাহিমকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মিসেস বদরুনেসা আহমেদ ও বেগম নুরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তাছাড়া জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। পৌরসভাগুলোতে তিনি ২টি মহিলা কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন।

৯. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন

১৯৭৪ সালে এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে নারীর বিবাহিত জীবনের অনেক অধিকারের সুরক্ষা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সময় মহিলা ও শিশু উন্নয়নের কাজে গুরুত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটান। চাকুরিতে নারীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে নারী ও শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

লেখক: অধ্যাপক (অব.), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

শাফিকুর রাহী

বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূখণ্ডের অভ্যুদয় রচিত হয়েছিল বহু প্রাণ বিসর্জন, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের অপ্রতিরোধ্য অভিযানের ভেতর দিয়ে এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সূত্রপাত হয়েছিল বাংলা মায়ের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদ প্রতিরোধের রক্তাক্ত অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলো। আবার পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানে বিভক্ত। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের উষালগ্নেই পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতির কণ্ঠরোধের অপচেষ্টায় মেতে ওঠে অমানবিকভাবে। আরো বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ ও নিপীড়ন চালিয়ে যায় শাসকগোষ্ঠী। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলনের শেষভাগে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মুক্তিপাগল জনতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের জগৎ কাঁপানো ভাষণে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। বাংলাদেশের সে ঐতিহাসিক বিজয় ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধুর মেধা-প্রজ্ঞায় দীর্ঘকাল ধরে গণমানুষকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন যে, মানুষের অখণ্ড ঐক্যই কেবল পারে দুঃশাসনের ভীত কাঁপিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অধিকারহারা বাঙালি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল মাতৃভূমিকে রক্ষার মনোতাগিদে জ্বলন্ত প্রদীপের পরম স্পর্শে। দেশপ্রেম আর বাঙালির অকৃত্রিম ভালোবাসার গূঢ় গভীর ভাবনায় মগ্ন মনীষীর মন-আকাশে দোল খায় স্বাধীনতার লাল-সবুজ পতাকা। আর তিনি আনন্দ-আবেগে বাংলা মায়ের বীর তারুণ্যের মন জয় করার মন্ত্রমুগ্ধ বাণীতে আলিঙ্গন করেন আটষট্টি হাজার গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের মনোভূমি। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য কৃতিত্ব হলো ধর্ম-বর্ণের সকল জনমানুষের মন জয় করার ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব। যা দুনিয়ার খুব কম নেতারই এমন সৌভাগ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অহিংস আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একাত্তরের ঐতিহাসিক সাতই মার্চে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন– যা বিশ্ববাসীর জানা। এর আগে জাতির অধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় চৌদ্দ বছর কারাগারের অন্ধ সেলে বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে। তাঁকে ফাঁসির কাঠগড়া থেকে মুক্ত করেছে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বীর তরুণরা। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫শে মার্চ কালরাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিরস্ত্র-নিরীহপ্রাণ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আদিম বর্বরোচিত কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে গণহত্যা। নয় মাস ধরে চলে এ গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জীবন্ত নারী ও শিশুকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করার ভয়াবহ সে মারণতাণ্ডবে বিশ্ববাসী চমকে ওঠে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে প্রায় নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের ভেতর দিয়ে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। মূলত দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। বিশ্বমানবসভ্যতার আকাশে বাংলাদেশ নামক একটি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় গোটা বিশ্বের বিবেকবান বিদগ্ধজনের কাছে ছিল বিস্ময়ের। সে বীর তারকাদের রক্তের স্রোতধারায় অর্জিত বিজয়ী জাতিরাষ্ট্রের আজ অর্ধশত বসন্ত পূর্ণ হতে চলেছে।

স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ছোটো ভাই শেখ আবু নাসের, তিন সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ পরিবারের সদস্য শাহাদতবরণ করেন। ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা, কনিষ্ঠকন্যা শেখ রেহানা পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। ঘাতকরা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নকে হত্যার অপচেষ্টায় আদিম কায়দায় মেতে উঠেছিল। তারা জানে না বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে দেশের কোটি কোটি মুজিবপ্রেমীর স্বপ্ন সাধনাকে নস্যাৎ করা যায় না।

তারা আজ হয়ত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির আলোকিত স্বরূপ। ১৯৭৫ সালের মধ্যআগস্ট কালরাতে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২নং সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে যদি জীবন দিতে না হতো, তাহলে আজ বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুরো পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হতো বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার অবস্থান কোথায় কতটা সম্মানজনক অবস্থানে উপনীত হয়েছে। আমাদের সে সৌভাগ্য ধ্বংস হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পরাজিত ঘাতক-দালালদের হিংস্র থাবায়। তবে আশার কথা হলো, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দৃশ্যপট পুরোপুরি পালটে যেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ আশার আলোয় বেঁধেছে বুক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার।

শেখ হাসিনার মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে বঙ্গবন্ধুপ্রেমী জনগণ দিন বদলের কর্মসূচি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করছে উন্নয়নের সাফল্যগাথায়। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগেই

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কেবল দেশরত্নের সততা আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মহিমান্বিত চিন্তাধারার ফলে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সকল ক্ষেত্রে যে হারে উন্নয়ন অগ্রগতির সোনালি সোপান রচনা করতে সক্ষম হয়েছে অতীতে অন্য কোনো সরকার কখনো তা করতে পারেনি কিংবা পারার চেষ্টাও করেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ দরিদ্রপীড়িত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের এমন সাফল্যে গোটা দুনিয়া আজ বিস্মিত। এ দীর্ঘ পথচলায় কত না বাধার আঁধার ভেঙে ক্লান্তিহীন এগিয়ে চলার শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সন্তান জনদরদি নেতা শেখ হাসিনা। যিনি দেশদ্রোহী গুপ্তঘাতকদের সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে জানান দিয়েছেন বীর বাঙালির অতীতের গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বের মহিমায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকালে এমন আনন্দঘন দিনে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি ত্রিশ লক্ষ শহিদের স্মৃতির প্রতি। যাঁরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে এদেশের আকাশ ও মাটিকে শত্রুমুক্ত করতে বিরল আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন। বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি দুই লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের নির্মম বেদনাবিধুর স্মৃতির প্রতি। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি পঁচাত্তরের মধ্যআগস্টের কালরাতে শহিদ বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতাসহ যাঁরা শাহাদত বরণ করেছেন ঘাতকের হিংস্র থাবায়। স্মরণ করি তেসরা নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় চার জাতীয় নেতা এবং ২০০৪ সালে ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশে বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় বাইশজন শহিদের স্মৃতির প্রতিও জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, পঁচাত্তর পরবর্তী স্বৈরসরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন সামরিক হন্তারক সরকারের নির্মম হত্যাযজ্ঞে, তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। স্বাধীনতার ৫০ বছরে জামাত-শিবিরের দানবীয় তাণ্ডবে যেসব মুজিবপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকালে আমাদের সকলের শপথ হোক, দেশের শত্রু-খুনি-দুশমনদের এ পবিত্র জমিনে ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সে অশুভ দানবীয় গোষ্ঠী যেন আর কখনো ক্ষমতা দখল করতে না পারে। সেই দিকে আমাদের সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে করে বাংলাদেশের পরাজিত শত্রু ভয়ানক হন্তারকরা আর কখনো লাখো শহিদের রক্তেভেজা মাটিকে কলঙ্কিত করতে না পারে।

এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে এবং মুজিব জন্মশতবর্ষে বিশেষভাবে আমাদের মেধাবী বীর তারুণ্যের মনোজগৎকে জাগ্রত করতে হবে সৃজনশীল মুক্তজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। বাংলা মায়ের বীর তারুণ্য কালে কালে এমন অনেক মহত্তম মানবকল্যাণ কিংবা দেশপ্রেমের আলোকোজ্জ্বল ভূমিকা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধেও আমাদের বীর তারুণ্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে এ সকল উজ্জ্বল ইতিহাসের আলোয় আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে বিশ্ববীরের বীরত্বগাথায়। আর আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে, শক্তি ও সাহস জোগাবে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শ। আমরা তাঁর অমর আত্মত্যাগের গর্বিত গরিমায় জেগে উঠব অধিকার আদায়ে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অদমনীয় সংগ্রামে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড়ো মাহেন্দ্রক্ষণ। এই দিন জন্মগ্রহণ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শত শত বছর ধরে পরাধীন বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্ত করেছেন, স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বসভায় নতুন এক পরিচয়ে পরিচিত করে দিয়েছেন। আমাদের মনে, মননে ও অস্তিত্বে ঔপনিবেশিকতার যে দাসবৃত্তি শিকড় গেড়ে বসেছিল তিনি আমাদের সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন; সর্বতোভাবে তিনি আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিঞ্চিদধিক অর্ধশতকের এক স্বল্পায়ু জীবন উৎসর্গ করে তিনি বাঙালি জাতিকে হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছেন, একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি চিরায়ত বাঙালি পরিবারে। অর্থ-ঐশ্বর্য, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এই পরিবারটি শুধু টুঙ্গিপাড়ায়ই নয়, সমগ্র গোপালগঞ্জে পরিচিত ছিল। পরিবারটি মনে, মননে ও মানবিকতায় ছিল সম্ভ্রান্ত, উদার ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের প্রতিভূ। এই পরিবারেরই উত্তরসাধক শেখ মুজিবুর রহমান। জন্মসূত্রেই তিনি ধারণ করেছিলেন পরিবারের সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিসত্তার সকল ঐতিহ্য। খুব শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি অসামান্য দয়া-দাক্ষিণ্য ও মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসতেন, প্রতিবেশীদের ভালোবাসতেন, খেলার সঙ্গীদের ভালোবাসতেন, সহপাঠীদের ভালোবাসতেন, পশুপাখি ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন। গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় সর্বদাই থাকত সিক্ত, করুণাকাতর।

১৯৩৭ সালের কথা। তাঁকে ভর্তি করা হয় গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। বাসায় তাঁকে পড়াতেন কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি। এই শিক্ষক গোপালগঞ্জে 'মুসলিম সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের পক্ষে শেখ মুজিব ও অন্যরা থলি নিয়ে মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষার চাল উঠাত এবং ঐ চাল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই কেনা ও পরীক্ষার খরচাদির জোগান দেওয়া হতো। এছাড়া গ্রামে গ্রামে ঘুরে দরিদ্র ছেলেদের জায়গিরের ব্যবস্থা করে দেওয়াও ছিল এই সংগঠনের দায়িত্ব। শেখ মুজিব খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতেন। এই সেবার কাজে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ শিক্ষক আবদুল হামিদ মারা গেলে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিব। তরুণ শেখ মুজিব ছিলেন ঐ সংগঠনের সম্পাদক। 'যদি কোনো মুসলমান চাউল না দিত আমরা দলবল নিয়ে তার উপর জোর করতাম।...' [*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ২০১২, পৃ. ১০] তারুণ্যের খুব সহজ-স্বাভাবিক স্বীকারোক্তি। ভেতরে যে মানুষের সেবার জন্য, কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য গভীর তোলপাড় এই বক্তব্য তারই সরল প্রকাশ। তাঁর এই সেবার পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত ছিল। সমগ্র মহকুমায় যারা ভালো ফুটবল খেলত তাদের খুঁজে এনে তিনি মিশন স্কুলে ভর্তি করে দিতেন এবং বেতন মওকুফ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। শেখ হাসিনা লিখেছেন:

> তিনি [শেখ মুজিবুর রহমান] ছোটোবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায় আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে, তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।
>
> দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পাজামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছে। [*শেখ মুজিব আমার পিতা*, আগামী প্রকাশনী, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ২৮]

মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি এই অফুরন্ত ভালোবাসা ও দাক্ষিণ্য তাঁর এই স্বল্পায়ু জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এদেশের মানুষকে মুক্ত, স্বাধীন ও সুখী দেখার প্রত্যয়ের দিকে তীব্রভাবে পরিচালিত করেছে।

প্রচণ্ড রকম অধিকার সচেতনতা এবং অন্যায়, অসত্য ও বঞ্চনার প্রতি তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিবাদমুখরতার পরিচয় পাওয়া যায় শৈশব থেকেই। এসব বিষয়ে তিনি অনেক সময় ছিলেন একরোখা ও আপোশহীন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা এবং পরিশ্রম করার অবিশ্বাস্য ধৈর্য ও সক্ষমতা। স্কুলছাত্র শেখ মুজিব যখন গোপালগঞ্জ অবস্থান করছিলেন তখনই তাঁর মধ্যে তীব্রভাবে জনসম্পৃক্ততা, রাজনীতি সচেতনতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, অধিকার সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন জলের মতো পরিচ্ছন্ন ও ইস্পাতকঠিন মানুষ।

একদিকে যেমন তিনি অসহায় ও ছিন্নবস্ত্র কাউকে পরনের

জামাকাপড় দান করে চাদর জড়িয়ে বাড়িতে চলে আসতেন, রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য অন্যকে ছাতা দিয়ে দিতেন মাসের পর মাস, ঘরের চালের গুদাম উন্মুক্ত করে দিতেন হতদরিদ্র ও নিরন্ন মানুষের জন্য আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন শক্ত মনের দৃঢ়প্রত্যয়ী মানুষ। অন্যায়-অত্যাচার দেখলে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করতেন না।

১৯৩৮ সালের এমনই একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। লিখেছেন, আবদুল মালেক নামে তাঁর একজন সহপাঠী ছিল। হিন্দু মহাসভার লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে আটকে রেখে মারধর করছে। এই সংবাদ পেয়ে মুজিব সামান্যতম কালবিলম্ব না করে লোকজন নিয়ে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মালেককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সনাতন সম্পদায়ের লোকেরা মালেককে তো ছাড়ছিলই না উপরন্তু পুলিশকে খবর দেয় এবং শেখ মুজিবকে দেয় গালাগাল। শেখ মুজিব ঠিকই তাঁর দলবল নিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে মালেককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এই ঘটনার জন্য তাঁকে সেই শৈশবেই প্রথম জেল খাটতে হয়। কিন্তু তাই বলে তিনি বিন্দুমাত্র দমে যাননি। উপরন্তু এক জীবন তিনি অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর এই প্রচণ্ড একমুখী চেতনা জ্বালিয়ে রেখেছেন।

কোনো দিন তিনি আত্মগোপন করেননি, কখনোই তিনি পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেনি। সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়া তিনি কাউকে ভয় করেননি। বিপুল এক রাজনৈতিক জীবনে তিনি কত যে সংকটাপন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কখনোই তিনি রাজনীতির মাঠ ছেড়ে যাননি। অধিকন্তু সবাই যখন হতোদ্যম এবং পালানোর চেষ্টায় ছিলেন, নানা রকম স্বার্থের হাতছানিতে অনেকেই যখন ছিলেন বিভ্রান্ত ও দিকদিশাহীন তখন তিনিই তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসেবে কলকাতা জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির মহাসড়কে পদার্পণ করেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র'কে তিনি পেয়েছিলেন গুরু হিসেবে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তিচর্চা, ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিল্পসাহিত্য ইত্যাদির তীর্থভূমি কলকাতা শেখ মুজিবকে পরীক্ষিত রাজনীতিক করে তোলে। মেধা, মনন আর প্রজ্ঞায় তিনি পরিপুষ্ট হন। এক ধরনের সাত্ত্বিক জীবনবোধ লাভ করেন তিনি এবং তাঁর সমগ্র অস্তিত্বজুড়ে বিরাজ করে মানুষের মুক্তির প্রেরণা, যার একমাত্র বাহন রাজনীতি।

১৯৪৩ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে ভারত বিভাজন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনের ঐ দিনগুলোতে সদা-হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটি কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাঁর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে, শিক্ষকদের স্মৃতিচারণে, সহপাঠী ও সহকর্মীদের রচনায়। বিশেষ করে তাঁর সহপাঠী কাজী আহমেদ কামাল Sheikh Mujibur Rahman and Birth of Bangladesh গ্রন্থে তাঁর যে জীবনাচরণের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মানবিকতাবোধ, বন্ধুবাৎসল্য, প্রখর সংবেদনা, তীব্র মর্যাদাবোধ, অসাধারণ আনুগত্য, বিস্ময়কর সাংগঠনিক শক্তি, পরিশ্রম করার সামর্থ্য, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গতিবিধি বোঝার সংবেদনা এবং সর্বোপরি রাজনীতি বোঝার

পিতামাতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সক্ষমতা তাঁকে কিংবদন্তিতুল্য করে তুলেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি তৃতীয় রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র-স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন। এই দাবিতে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। যদিও এই উদ্যোগ বাতিল হয় তবুও শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নবীজ সেখান থেকেই উপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর রাজনীতি এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দিকেই ক্রমে এগিয়ে যায়।

দেশ বিভাগের পরে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি এবং পাকিস্তানের প্রথম বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রস্তাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং বাংলা ভাষা দাবি দিবসে ধর্মঘট চলার সময় কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া সংবলিত আন্দোলনকে সমর্থন করলে অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁকেও বহিষ্কার করা হয়। নানা শর্তে প্রায় সবাই বহিষ্কারাদেশ থেকে ক্ষমা পেয়ে ছাত্রত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। কিন্তু শেখ মুজিব স্বার্থের জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করার মানুষ নন। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রত্ব শেষ হয়। কিন্তু তাঁকে কখনোই বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি, তিনি সামান্যতম হতাশ হননি। অধিকন্তু জীবনের এইসব দুঃসময়গুলোকে তিনি সুসময়ে পরিণত করেছেন এবং তিনি পুরোমাত্রায় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে নতুন অধ্যায়ের সুযোগ লাভ করেন তার ভেতরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন স্বাধিকার আন্দোলনের সব ধরনের উপাদান। বিচিত্র ধর্ম-গোত্র-শ্রেণি-পেশার বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ

করার জন্য ভাষা আন্দোলনের চেয়ে ভালো আর কোনো ইস্যু থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিটি বাঙালির দোরগোড়ায়।

সুতরাং তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তারপর '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৩-তে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ; '৫৪-তে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং গোপালগঞ্জ থেকে তিনি নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শপথ গ্রহণ; '৫৫-তে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করে সংগঠনকে একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণতকরণ; '৫৬-তে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তাঁর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ; '৫৭-তে তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত; '৫৮-তে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং শেখ মুজিবকে বার বার নিক্ষেপ করে কারাগারে। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। '৬৬-তে লাহোরে

ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব স্বাধীনতার বীজমন্ত্র ছয় দফা উত্থাপন করেন। এই ছয় দফাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং প্রতিটি মানুষের কাছে ছয় দফার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তিনি চষে বেড়িয়েছেন বাংলার শহর-বন্দরে, হাট-বাজারে, গ্রামে গ্রামে। দেশব্যাপী তাঁর বিপুল এই গণসংযোগের ফলে মানুষের মধ্যে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে জাগরণ তৈরি হয়। মিছিল মিটিং আর স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি জনপদ। সেই বিপুল গণজাগরণকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী মরণখেলায় মেতে ওঠে। তারা শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন বাঙালির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে প্রকারান্তরে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে এই গণআন্দোলন শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। '৬৯-এ সারা দেশে বিপুল গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দির মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বিশাল ছাত্রসমাবেশে কেন্দীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। রচিত হয় নতুন আরেক অধ্যায়। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর অভূতপূর্ব নেতৃত্বে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের বৈধ অধিকার অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী টালবাহানার আশ্রয় নেয়। রাজনীতির এমনই এক সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু অনানুষ্ঠানিকভাবে সুকৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বস্তুত তখন বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রিত হয় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত, বাঙালির গণ-আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তারা যখন তলিয়ে যাওয়ার পথে তখনই ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করা হয়। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তিনি ছড়িয়ে ছিলেন প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে। তাঁর নির্দেশনা ও প্রেরণার শক্তিতে উজ্জীবিত বাঙালি তখন মরণকে জয় করে যুদ্ধে আত্মসমর্পিত। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও শত্রুমুক্ত করতে হবে দেশকে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৬ই ডিসেম্বর নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, যার নাম 'বাংলাদেশ' আর তার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অসাধারণ এক কর্মপ্রেরণার ভেতর দিয়ে তিনি জাগিয়ে তুলতে চাইলেন সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে। যে প্রেরণা নিয়ে এদেশের তিরিশ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রমহানির মতো ত্যাগ স্বীকার করেছেন– সেই দেশের মানুষ যে সব করতে পারেন সেই প্রেরণায় তিনি উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন সবাইকে। তাঁর সামনে তখন বিপুল কর্মযজ্ঞ। তিনি বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বাঙালি জাতি আত্মনির্ভরশীল হবে, মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হবে– এই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। যখন এই স্বপ্নের দোরগোড়ায় তিনি উপনীত ঠিক তখনই একাত্তরের পরাজিত দেশি-বিদেশি অপশক্তির ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। দেশ চলে যায় পরাজিত অপশক্তির হাতে। তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যা কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর তার বিনাশ নেই। তারা জানত না বঙ্গবন্ধু সত্যের প্রতীক, সুন্দরের প্রতীক, কল্যাণের প্রতীক। তিনি মিশে আছেন এদেশের আলো-বাতাসে, প্রবহমান নদীর স্রোতধারায়, উর্বর মৃত্তিকার প্রতিটি কণায়, ঢেউ খেলানো শস্যের তরঙ্গে; তিনি মিশে আছেন পাখপাখালির কলতানে, তিনি আছেন প্রতিটি বাঙালির অন্তরে অন্তরে। চিরায়ত বাঙালি জীবনের সকল প্রত্যয়ে ও প্রতিজ্ঞায় প্রবলভাবে তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতায় যথার্থভাবেই এই মহামানবের চিরকালীনতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন : যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বিশ্বের চোখে বঙ্গবন্ধু

ড. শিহাব শাহরিয়ার

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে...' এই উচ্চারণ করেছেন রূপসি বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। কবিতায় হাজার বছর হাঁটলেও তিনি বেঁচে ছিলেন পঞ্চান্ন বছর। 'বাংলাদেশ' নামক কাব্যের অমর কবি বঙ্গবন্ধুও বেঁচে ছিলেন মাত্র পঞ্চান্ন বছর। অথচ এই বয়সেই তিনি হিমালয়ের সমান খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেখতেও ছিলেন বিশাল, মানুষও ছিলেন আরো বিশাল। জীবিতকালেই তিনি খ্যাতির তুঙ্গে উঠেছিলেন। আর ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে মৃত্যুর পর পৃথিবীময় তাঁর কীর্তি হয়ে উঠেছে মহামানবের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যেমন বলেছেন, 'ঐ মহামানব আসে...' বঙ্গবন্ধুই হলেন সেই বাঙালিদের মহামানব যিনি এনে দিয়েছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশকে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলার মতো করে। কিন্তু নরপশু ঘাতকরা তাঁকে সেটি করতে দেয়নি। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঘাতকদের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব হাজার হাজার গুণে উজ্জ্বল হয়েছেন। তার প্রমাণ আমরা দেখি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত যত কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, তথ্যচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে; পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে তা হয়নি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কবি ও লেখকরা লিখেছেন লক্ষ লক্ষ লেখা। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের এক অখ্যাত মুজিব ভক্তও তাঁকে নিয়ে লিখেছেন পঙ্‌ক্তিমালা। পঙ্‌ক্তিমালা রচনা করেছেন ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা। তারা বঙ্গবন্ধুকে এঁকেছেন তাদের নরম হাতে মনের রংতুলিতে। কী মর্মস্পর্শী সেই উচ্চারণ, কী আনন্দঘন সেই চিত্রকলা, কী অসাধারণ শ্রুতিমধুর সংগীত– যেন মধুমতী আর বাইগারে কলকল ধ্বনি। যেমন আমার কবিতায় আমি বলেছি, 'ঢেউয়ের নদী প্রাণের নদী মধুমতীর বুকের ভিতর/ ফুল শিমুল আর কুহুকুহু কোকিলের স্বরের ভিতর/ আমাদের মন যমুনা ষড়ঋতুর মূর্ছিত সুরের ভিতর/ কার নাম তাঁর নাম বার বার বার বার বেজে ওঠে/ কোথায় তিনি কোথায় আকাশ কোন সে আকাশ/ তিনিই আকাশ তিনি আমার বাংলাদেশের আকাশ'। কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর কবিতায় উচ্চারণ করলেন, 'সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি/ রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ/ গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি/ আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি। শহীদ মিনার ভেঙ্গে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে/ আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি। /আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি'।

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শুধু কবিতা বা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব মিডিয়া এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর সমসাময়িক বিশ্ব নেতারা তাঁকে নিয়ে যে মূল্যায়ন ও মর্মবেদনার কথা বলেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখে ছিলেন এক ঐতিহাসিক ক্ষণজন্মা মহান পুরুষ। তাই অনন্য সাধারণ এ নেতাকে স্বাধীনতার প্রতীক বা রাজনীতির ছন্দকার খেতাবেও আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। বিদেশি ভক্ত, কট্টর সমালোচক, এমনকি শত্রুরাও উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ ও নেতৃত্বের।

লন্ডনের *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর সংখ্যায় মাইকেল বার্নস তাঁর Prospect for Bangladesh শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধে মন্তব্য করেন– For the moment Bangladesh's greatest asset remains Bangabandhu himself. Sheikh Mujib's extra ordinary dynamism and charisma is still there, may be slightly dented by the sheer intractability of the problems, but still the force that inspires and untieds his people.

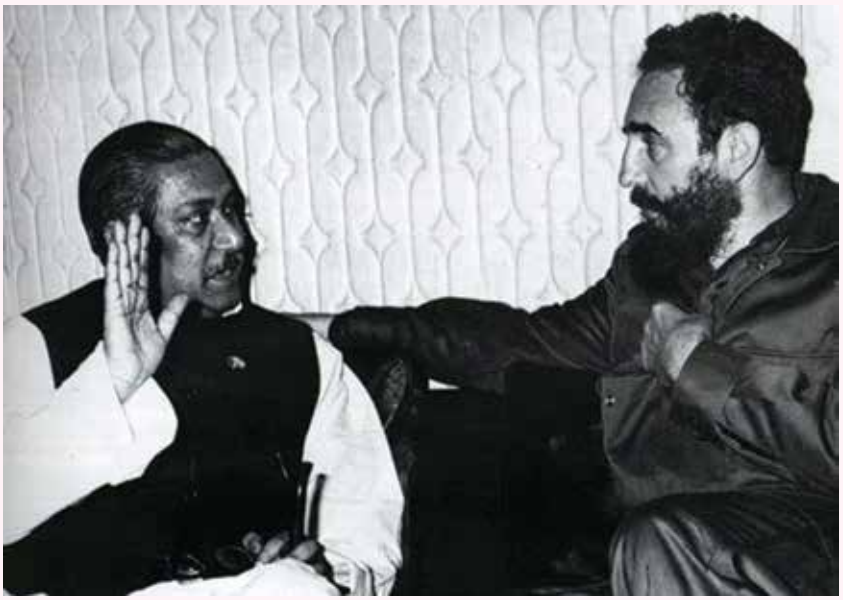

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিশ্বের প্রভাবশালী মিডিয়া বঙ্গবন্ধুকে বর্ণনা করেন এভাবে– 'তিনি এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যার সামনে সহসা মাথা ন্যুয়ে আসে।' এই উপমহাদেশের বাঙালি মনীষীদের নিয়ে পরিচালিত বিবিসি'র এক জরিপে সবাইকে ছাড়িয়ে যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক *দ্য গার্ডিয়ান*-এর মতে, 'শেখ মুজিব ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব'। *ফিনান্সিয়াল টাইমস* বলেছে, 'মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কখনই জন্ম নিতো না।' ভারতীয় বেতার 'আকাশ বাণী' ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট তাদের সংবাদ পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে বলে, 'যিশু মারা গেছেন। এখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্রস ধারণ করে তাকে স্মরণ করছে। মূলত একদিন মুজিবই হবেন যিশুর মতো।' একই দিনে লন্ডন থেকে প্রকাশিত *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় বলা হয়েছে,

বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব মি. রমেশ চন্দ, ২৩শে মে ১৯৭৩

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করবে।' *নিউজ উইকে* বঙ্গবন্ধুকে আখ্যা দেওয়া হয়, 'পয়েট অব পলিটিক্স' বলে।

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ক্যাস্ত্রোর। বিশ শতকের জীবন্ত কিংবদন্তি কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি হিমালয়কে দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এ মানুষটি ছিলেন হিমালয়ের সমান। সুতরাং হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি'। ইরাকের সেনা-অধিপতি ও মুসলিম নেতা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম শহিদ তাই তিনি অমর'। ব্রিটিশ লর্ড ফেন্যার ব্রোকওয় বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব জর্জ ওয়াশিংটন, গান্ধী এবং দ্যা ভ্যালেরার থেকেও মহান নেতা। জাপানি মুক্তি ফুকিউরা আজও বাঙালি দেখলে বলে বেড়ান, 'তুমি বাংলার লোক? আমি কিন্তু তোমাদের জয় বাংলা দেখেছি। শেখ মুজিব দেখেছি। জানো-এশিয়ায় তোমাদের শেখ মুজিবের মতো সিংহ হৃদয়বান নেতার জন্ম হবে না বহুকাল।'

শ্রীলংকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষণ কাদির গামা উপমহাদেশের এ মহান নেতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছুকে ছাপিয়ে যান, তাঁর স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সর্বকালের সর্বোচ্চ আসনে। মুজিবুর রহমান রাজবংশের সন্তান নন, তিনি পাশ্চাত্যের বিলাসী উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন এক নিভৃত পল্লির মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সাধারণ মানুষ। শেখ মুজিব বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণির মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। বাংলার মানুষ তাদের ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষিত, বাগ্মী বা প্রাণবন্ত নেতার সাক্ষাৎ পেলেও তাঁর মত সফল নেতা কেউ ছিলেন না। তিনি বাঙালি জাতির স্বপ্নপূরণ করেছেন, তাদেরকে একটি স্বাধীন– সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন'।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের ভাষায় বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন 'ঐশ্বরিক আগুন' এবং তিনি নিজেই সে আগুনে ডানা যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত বলেন, 'প্রথম সরকারপ্রধান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উপমহাদেশে বাংলাদেশের পৃথক জাতিসত্তায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সংকট গভীর হওয়ায় মুজিব উপলব্ধি করেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ব্যাপক সমর্থনের ওপরই কেবল তার সংগ্রামের সাফল্য নির্ভরশীল নয় বরং এক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক ও আনুষঙ্গিক সমর্থন প্রয়োজন'। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের প্রথম সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ মুজিব এ উপমহাদেশে স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয়ে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন'।

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করলেও ইতিহাসই তাঁর প্রকৃত অবস্থান নিশ্চিত করেছে। ফলে তাঁর এককালীন ঘোরতর শত্রু তাঁকে মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাবেক পাকিস্তানি (বেলুচিস্তান) অফিসার মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক পরে তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, (পাকিস্তানে তাকে ব্যাপকভাবে এই অপবাদে চিত্রিত করা হলেও) 'বস্তুত মুজিব দেশদ্রোহী ছিলেন না। নিজ জনগণের জন্য তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক'। আরেকজন সেনা কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানি জান্তার মুখপাত্র মেজর সিদ্দিক সালিক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ৭ই মার্চের ভাষণের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তার 'পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ঘরমুখী মানুষের ঢল নামে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল আশাব্যঞ্জক বাণী শ্রবণ শেষে মসজিদ অথবা গির্জা থেকে তারা বেরিয়ে আসছেন'। তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার হবে– পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এ ঘোষণার পর গোটা বিশ্ব প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়লে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার অবস্থান স্পষ্ট হয়। তৎকালীন জাতিসংঘ

১৯৭৩-এর ৫ই সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে চতুর্থ ন্যাম সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে আলোচনা করেন

মহাসচিব উথান্ট এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নিয়ে নতুন করে বাড়াবাড়ি করলে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে পাকিস্তান সীমান্তের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।' বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর এ জনপ্রিয়তার কারণে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পর্যন্ত আশঙ্কা করেন ইয়াহিয়ার প্রতি সমর্থনের জন্য নিক্সন প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। এ কারণে পাকিস্তানকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়, শেখ মুজিবকে ফাঁসি অথবা দীর্ঘদিন কারাবন্দি করে রাখা হলে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারাবে। ১১ জন মার্কিন সিনেটর এক যৌথ বিবৃতিতে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

হেলসিনকি ভিত্তিক বিশ্ব শান্তি পরিষদের (ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল) এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রহসনের বিচার এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের স্বৈর-সরকার বিশ্ব দরবারে জনগণের অধিকার অবজ্ঞা ও সকল নৈতিকতা বিবর্জিত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের দলকে ১৬৭টি আসনে বিজয়ী করাই ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বিশ্লেষক বা গণমাধ্যমের বাইরে বঙ্গবন্ধু বিদেশি জনগণেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আমেরিকান মিশনারি জেনিন লকারবি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চট্টগ্রামে ছিলেন। তার 'অনডিউটি ইন বাংলাদেশ' বইয়ে তিনি লিখেছেন এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটছে, যে অনগ্রসর বাঙালি জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দেবে, তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান; আদর করে ডাকা হয় 'মুজিব'।

ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডসের সদস্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, সংগ্রামের ইতিহাসে লেনিন, রোজালিনবার্গ, গান্ধী, নকুমা, লুমুমবা, ক্যাস্ত্রো ও আলেন্দের সঙ্গে মুজিবের নামও উচ্চারিত হবে। তিনি বলেন, তাঁকে হত্যা করা ছিল মানব হত্যার চেয়ে অনেক বড়ো অপরাধ। শেখ মুজিব শুধু তাঁর জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি। তিনি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও সংগ্রাম করেছিলেন।

সেনেগালের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদু দিউফ বঙ্গবন্ধুকে অন্যতম মহান ও শ্রদ্ধাভাজন নেতা হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯৯৯ সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে এ আফ্রিকান নেতা বলেছিলেন, আপনি এমন এক মহান পরিবার থেকে এসেছেন, যে পরিবার বাংলাদেশকে অন্যতম মহান ও শ্রদ্ধাভাজন নেতা উপহার দিয়েছে। আপনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আপনার দেশের জনগণ যথার্থই বাংলাদেশের মুক্তিদাতা হিসেবে বেছে নিয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালীন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উপমহাদেশের গণতন্ত্রের এক প্রতিমূর্তি, এক বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের এক মহান বন্ধু ছিলেন।'

সবচেয়ে বড়ো উচ্চারণটি করেছেন লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি বলেছেন, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'। আর বাঙালি মুখে থাকবে বঙ্গবন্ধুর শেষ উচ্চারণ: 'জয় বাংলা'।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কিপার, জনশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর

দেশের প্রথম নৌকা জাদুঘর বরগুনা জেলায় উদ্‌বোধন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত এ জাদুঘরের নাম রাখা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর'। দেশ-বিদেশের বাহারি নকশার ১০০টি নৌকার অনুকৃতি নিয়ে নির্মিত হয় এ বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘরের। শহরের প্রাণকেন্দ্র বরগুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন ৭৮ শতাংশ জমিজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর। বিশাল নৌকার আদলে তৈরি এ জাদুঘরটির দৈর্ঘ্য ১৬৫ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট। স্বয়ংসম্পূর্ণ এ জাদুঘরে থাকবে– নৌকা গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক পাঠাগার, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার, শিশু বিনোদন কেন্দ্র এবং ফুড কোর্টসহ নানা আয়োজন।

বরগুনার জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় মাত্র ৮১ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয় বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘরের নির্মাণের কাজ। হাজার বছর ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নৌকা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে নৌকা। বরগুনার বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর-এর মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বাহারি আকৃতির নৌকার দেখা পাবে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: পরিপ্রেক্ষিত ও গুরুত্ব

ড. সুলতানা আক্তার

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ অকস্মাৎ বেলা ১টা ১৫ মিনিটে পাকিস্তান বেতারে পঠিত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে।[১] বেতারে প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ছাত্রসহ সমস্ত শ্রেণির মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকা সঙ্গে সঙ্গে একটি বিক্ষুব্ধ মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ১লা মার্চ দুপুরের ঐ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালিরা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের মতো মানসিক অবস্থায় উন্নীত হয়। তারা অনুধাবন করে পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি সামরিক বেসামরিক আমলা ও ক্ষমতাভোগী নেতৃত্ব বাঙালির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং ক্ষমতায় যেতে হলে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নেই।[২] এ প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলী খানের পর্যবেক্ষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> ১লা মার্চের দুপুরে যখন পরিষদের অধিবেশন মুলতবি সংক্রান্ত ঘোষণাটি প্রচারিত হল, তখন প্রত্যেক বাঙালির প্রতিক্রিয়া ছিল সহিংস এবং সকলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার মারাত্মক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র বাঙালি জাতিই এবার যুদ্ধের পথে নেমে গিয়েছিল। ঘোষণাটির মধ্য দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, অধিবেশন মুলতবি করার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১লা মার্চেই পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঘটেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলি ছিল প্রধান ঘটনাবলির অনুসরণ মাত্র।[৩]

এই সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল। রেডিওতে এই ঘোষণা শোনার পর মাঠ ভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক সবাই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাজপথ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে।[৪] এটা কারো নেতৃত্বে বা নির্দেশনায় নয় জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা, বাঙালি মানে না', 'পাকিস্তানের পতাকা, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান, আজিমপুর গোরস্থান' ইত্যাদি স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।[৫] বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ বিকেলে হোটেল পূর্বাণীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি ২রা মার্চ ঢাকা শহরে হরতাল এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্সে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে ১লা মার্চ থেকেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২রা মার্চ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে সমবেত হন। এখানেই সর্বপ্রথম সবুজের মাঝখানে লাল সূর্যখচিত বাংলাদেশের হলুদ রঙের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৬] ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে সূর্য সেন এবং ইকবাল হলের নাম পালটে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রাখেন। নাম পালটানো চলল সর্বত্র। জিন্নাহ এভিনিউ হলো বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মহাখালীর জিন্নাহ কলেজ হলো তিতুমীর কলেজ, পুরান ঢাকার কায়েদে আজম কলেজ হলো সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পাক মোটর হলো বাংলা মোটর।[৭] ৩রা মার্চ ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতাহার' পাঠ করেন। এটাই ছিল প্রকাশ্যে দেওয়া স্বাধীনতার প্রথম লিখিত ঘোষণাপত্র, যদিও তা ছিল অনানুষ্ঠানিক। ইশতাহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৮] এ ইশতাহারে বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। নতুন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার রূপরেখা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এই ইশতাহারে ঘোষিত হয়। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের এই বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।[৯]

সর্বস্তরের মানুষ এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস লিখেছেন:

> On 3rd March Mujibur Rahman called a province wide strike and launched a non-violent non-co-operation movement… Everywhere the people responded to Sheikh Mujib's appeal and the movement become more orderly and effective;... Restoration of order in Dacca was assisted by the withdraw of troops after it was found they could not enforce the curfew. The troops also began to feel the Pinch of hunger as supplies, including foodstuffs, were denied on the orders of the Awami League. [১০]

৪ঠা মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এদিনের ঘটনাবলি প্রকাশ করতে গিয়ে ৫ই মার্চ *দৈনিক ইত্তেফাক* সংবাদ শিরোনামে লিখেন 'জয় বাংলার জয়'। *ইত্তেফাকের* রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিখেছেন:

> ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই যে দেশের শক্তির উৎস, বাংলাদেশের বিগত তিনদিনের ঘটনাবলী তাহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে। 'অস্ত্রের ভাষায়' মোকাবিলায় স্বাধিকারকামী নিরস্ত্রের সংগ্রাম প্রথম পর্বে জয়যুক্ত হইয়াছে।[১১]

অসহযোগ আন্দোলনকালীন এই আন্দোলন দমন করতে সামরিক জান্তা বিভিন্ন স্থানে নিরীহ জনগণের ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে অনেক লোক নিহত ও আহত হন। ৫ই মার্চের আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে *দৈনিক পাকিস্তানে* বলা হয়:

> কল-কারখানায় বাজছে না বাঁশি। মানুষ নেই অফিস-আদালতে। অগ্নিগর্ভ দেশ আজ পথে নেমেছে। এক-দুই করে কাল কেটে গেছে চারদিন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বেসামরিক শাসনব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধিকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে মানুষ– রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়–বিক্ষুব্ধ এই বাংলাদেশ।[১২]

৬ই মার্চ লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন।[১৩] বস্তুতপক্ষে এটা ছিল একটা ভাওতা মাত্র। গণহত্যার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানির প্রয়োজনীয় সময় লাভ করার জন্য ঐ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিসিং কনটেম্পরারি আরকাইভস লিখেছে:

> Broadcasting on March 6, President Yahya expressed his 'sincere hope that this decision will elicit a patriotic and constructive response from our political Leaders'.[১৪]

৬ই মার্চ সানাউল হকের নেতৃত্বে সচিবালয়ের অসামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী চলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। তাজউদ্দীন আহমদ, আমীর-উল-ইসলাম ও কামাল হোসেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন বৈঠক করে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করতেন। পরবর্তী দিনগুলোয় তাঁরাই প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু (নিউক্লিয়াস) হয়ে উঠেছিলেন।[১৫] এ বিষয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> অসহযোগ আন্দোলনের সময় এখানে হাইকমান্ড নামে একটা পাওয়ার স্ট্রাকচার গড়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট; সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলি তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট; তাজউদ্দীন আহমদ এবং কামরুজ্জামান দু'জন সাধারণ সম্পাদক-এই পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের হাইকমান্ড গঠিত ছিল এবং এঁরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ওই হাইকমান্ডের সাথে আলোচনা না করে বঙ্গবন্ধু কোন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেননি। প্রত্যেকটি ঘটনাতে এবং দিনে বোধ হয় একবার তো বটেই দুই-তিনবারও তাঁদের বৈঠক হত। সে সময়ে তাজউদ্দীন সাহেবের উপর মূল যে দায়িত্ব ছিল সেটা হচ্ছে, প্রতিদিন কী নির্দেশ যাবে জনগণের কাছে, কী করবে, কী করবে না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতটুকু খোলা থাকবে কতটুকু থাকবে না– এইগুলো পরিকল্পনা করা, নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি।[১৬]

৬ তারিখেই বঙ্গবন্ধুর বাসায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় পরদিন অনুষ্ঠেয় জনসভার ভাষণের বিষয়বস্তু কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। দলের তরুণেরা চাইছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হোক। তাদের কাছে স্বাধীনতার কোনো বিকল্প গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এইদিন বঙ্গবন্ধু দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে বসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান। আলোচনা হয় যে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামরিক বাহিনী হামলা করার অজুহাত পেয়ে যাবে। সুতরাং এটি করা ঠিক হবে না। বরং ইয়াহিয়ার ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করেন। একইসঙ্গে স্বাধীনতার পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।[১৭] সিদ্ধান্ত হয় যে, ৭ই মার্চের জনসভার পর বঙ্গবন্ধুর বিবৃতি সাংবাদিকদের দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী বিবৃতিটি তাজউদ্দীন আহমদের কাছে রাখা হয়, যাতে জনসভার পর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুযায়ী প্রয়োজনে এই বিবৃতি সংশোধন বা পরিবর্তন করে তাজউদ্দীন এটি সাংবাদিকদের দিতে পারেন।[১৮] ৭ই মার্চের রেসকোর্সের জনসভাটি ছিল পূর্বনির্ধারিত। ঐ দিন বঙ্গবন্ধু কী বলবেন, তা নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। আগের দিন ও রাতে তাঁর হাইকমান্ডের সদস্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ মনে করেছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হবে অসময়োচিত। তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য দলের তরুণদের চাপ ছিল।[১৯] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন:

> আওয়ামী লীগের তরুণেরা, যেমন সিরাজুল আলম খান যিনি কাপালিক নামে পরিচিত, এখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পুরোদস্তুর মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার পক্ষে ছিলেন। ৭ই মার্চের সভায় যাওয়ার আগে নুরুল ইসলাম ও আমি তাদের মনের ভাব জানার জন্য ইকবাল হলে গেলাম। কাপালিকের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে হতাশ মনে হলো। তিনি বললেন, স্বাধীনতার কোনো নাটকীয় ঘোষণা আসছে না।[২০]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। মাত্র ১৮ মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে, পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনীতি ও বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন নির্দেশ

ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেওয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবিলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে-কোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।[২১] বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তার দলের যোগদানের জন্যে ৪টি শর্ত বেঁধে দেন। এগুলো হলো:[২২]

১. অবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নিতে হবে;
২. সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে;
৩. ১-৭ই মার্চের মধ্যে সামরিক বাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলায় সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে কমিশন গঠন করতে হবে এবং
৪. জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু এসব বিষয় তুলে ধরার পর ঘোষণা করেন:

> প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।[২৩]

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমাপ্তির পর জনগণের অনুভূতি সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক মন্তব্য করেছেন: 'They looked like a religious congregation returning from mosque or church after listening to a satisfying sermon.'[২৪] বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল একজন দক্ষ কৌশলীর সুনিপুণ বক্তব্য উপস্থাপন। ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি 'স্বাধীনতার' কথা এমনভাবে উচ্চারণ করেন, যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকলো না, আবার তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার (Unilateral Declaration of Indepence-UDI) অভিযোগ উত্থাপন করাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য সহজ ছিল না।[২৫] *The Daily Telegraph* পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক ঢাকা থেকে প্রেরিত 'The end of the old Pakistan' শিরোনামযুক্ত এক প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

> On Sunday (7th March) Sheikh Mujib came as near to declaring this (Independence) as he could without inviting immediate harash reaction from the Army.[26]

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। এরূপ ঘোষণাদানের ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব যা-কিছু তা একমাত্র তাঁরই ছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তা অর্জন করেন। সে কারণে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন মওলানা ভাসানীসহ পূর্ব বাংলার প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতাকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান জানাতে দেখা যায়।[২৭] বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও এই ভাষণ প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই বাঙালি জাতির জীবনে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিক জানতে দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ.-৭৫৯-৭৬০।
২. কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, ঢাকা অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮,পৃ.-২০৮।
৩. রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম*, শাহ আহমদ রেজা (অনুদিত), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১, পৃ-৫৯।
৪. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলো*, ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ-১০।
৫. সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, ঢাকা, সুবর্ণ, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ-৫৫।
৬. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ-১২৬।
৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭,পৃ-৪২।
৮. মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ-৪১।
৯. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩।
১০. Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh*, New Delhi, Vikash Publishing House, 1971, P-90.
১১. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৫ই মার্চ, ১৯৭১।
১২. দৈনিক *পাকিস্তান*, ৫ই মার্চ, ১৯৭১।
১৩. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকা, সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ-৮২।
১৪. *Keesing's Contemporary Archieves (KCA),* (1971-1972), pp-24566.
১৫. Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, Dhaka University Press Limited, 2013, p-86.
১৬ ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম এর রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ১০ই নভেম্বর, ২০১৮। আমীর-উল-ইসলাম একজন খ্যাতিমান আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সহযোগী আইনজীবী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কজন নেতা মুজিবনগর সরকার সংগঠন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি তাজউদ্দীন আহমদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।
১৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫-৪৬।
১৮. Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, op.cit., p-86.
১৯. মহিউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭।
২০. Rehman Sobhan, *Untranquil Recollection: The Yours of Fulfilment,*New Delhi, Sage, 2016, p-328-329.
২১. ড. হারুন-অর-রশিদ, 'ছেষট্টি থেকে একাত্তর', মো. আখতারুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট* ও ঘটনা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এপ্রিল ২০০৯,পৃ-৪৫।
২২. *The Dawn,* 8th March, 1971.
২৩. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৭০০-৭০২।
২৪. Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, Dhaka, University Press Limited., 1985, p-54.
২৫. ড. হারুন-অর-রশিদ, 'ছেষট্টি থেকে একাত্তর', প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫।
২৬. *The Daily Telegraph*, 10th March, 1971.
২৭. ড. হারুন-অর-রশিদ, 'ছেষট্টি থেকে একাত্তর', প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫-৪৬।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

রংপুরে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা: ঐতিহাসিক মানপত্র

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার কথা আছে। রূপক বিশ্লেষণ শেষে স্বীকৃত সত্য বেরিয়ে এসেছে– এ পথপরিক্রমা মানবসভ্যতার। যা অব্যাহত হাজার হাজার বছর ধরে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও মানবকল্যাণ, মানবমুক্তির দ্বার উন্মোচন, অত্যাচার আর শোষণের পথ রুদ্ধ করার জন্য ঘুরেছেন পূর্ব বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। বাংলার স্বাধিকারের দাবি নিয়ে গেছেন পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের কাছে, বিশ্ব দরবারেও তুলেছেন মুক্তির যৌক্তিকতা। জেলের প্রকোষ্ঠে বন্দিত্ব রুদ্ধ করতে পারেনি তাঁর সৃজনশীলতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পরিধি বিস্তারে গেছেন মানুষের ঘরে ঘরে। আওয়ামী লীগের সাথে থেকে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ মুক্তিতে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন অকপটে। মসৃণ ছিল না তাঁর কোনো যাত্রাই। কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গমপথ পাড়ি দিয়েছেন মানুষের গভীর ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়ে। সে ভালোবাসা নির্বিশেষ মানুষের। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেছেন জনগণের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতার ও সাধারণ মানুষ যে তাঁকে কতটা ভালোবাসে সে প্রসঙ্গ। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–'আমি যে গ্রামেই যেতাম, জনসাধারণ শুধু আমাকে ভোট দেওয়ার ওয়াদা করতেন না, আমাকে বসিয়ে পানদানের পান এবং কিছু টাকা আমার সামনে নজরানা হিসেবে হাজির করত এবং না নিলে রাগ করত। তারা বলত, এ টাকা নির্বাচনের খরচ বাবদ দিচ্ছি।' এমন দুর্লভ ভালোবাসার মূল্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তিনি সত্তরের নির্বাচনে বলিষ্ঠ চিত্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ভোট প্রার্থনা করেছেন। পাকিস্তানি অপশাসনের ভীতি মন থেকে সরিয়ে তুলে ধরেছেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও অত্যাচারের নির্মম, জঘন্য ইতিহাস। এসেছেন রংপুরেও।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এক সাগর রক্তে আকাশে ওড়ে বাংলার স্বাধীন পতাকা। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের বুকে লেখা হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম। পাকিস্তানিরা বাধ্য হয় বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে। ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু। আবেগমথিত কণ্ঠে ঋণ স্বীকার করেন বাংলার স্বাধীনতার জন্য যার যেমন অবদান প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেক দেশের কাছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ গঠনে ব্রতী হয়ে সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের সামগ্রিক অবস্থা নিজে দেখার জন্য চলে যেতে থাকেন জনগণের কাছাকাছি। জেলায় জেলায় সফরের অংশ হিসেবে রংপুরে আসেন দেশ স্বাধীনের মাত্র ৪ মাসের মধ্যে। ১৯৭২ সালের ১১ই মে। বাংলা ২৮শে বৈশাখ, ১৩৭৯ । সেদিন বিশাল জনসভার আয়োজন হয়েছিল রংপুর কালেক্টরেট ময়দানে। জনসভাটি পরিচালনা করেছিলেন আমিনুল ইসলাম বাদশা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান। স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রথম সভা তাই রংপুরের মানুষের অন্তহীন আনন্দ, বিপুল উচ্ছ্বাস সবার মনে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রংপুর সার্কিট হাউজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আদর করেছিলেন। জাতির পিতার অনেক ছবির মতো সেই ছবিটিও আজও অম্লান

মানুষের ঢল। যেন বাঁধনহারা সমুদ্রস্রোত।

জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাবার অন্যান্য আয়োজনের সাথে যুক্ত করা হয় একটি মানপত্র। এটি রচনার দায়িত্ব পান বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রংপুর কলেজের অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। মনের মাধুরী মিশিয়ে, রংপুরের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমন্বয় ভাবনা তুলে ধরে মানপত্রটি রচনা করেন তিনি। পাঠও করেন নিজে। এখন আলোকপাত করব বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ঐতিহাসিক মানপত্রটি সম্পর্কে।

সূচনায় আছে–

'প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে রংপুর জেলার জনসাধারণের অভিনন্দন।' এর পর সম্বোধন করা হয়েছে – ' হে জনগণমন অধিনায়ক,' বলে। এ সম্বোধন একান্তই যথাযথ। কারণ বঙ্গবন্ধু জনমন হরণ করা জাতির অধিনায়ক। বাংলার মানুষ তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়ে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। মানপত্রের সূচনায় উদার চিত্তে স্বাগত জানানো হয়েছে মহান নেতাকে। লেখা হয়েছে– 'স্বাগতম। সুস্বাগতম তোমায়।' স্বাগত জানানোর পর নবীন স্বাধীনতার সূর্যের সাথে তুলনা করে লেখা হয় -'নবীন রক্তাক্ত সূর্যোদয়ের আনন্দ আজ ছড়িয়ে পড়েছে, তোমার আগমনে। আঁধারের দুয়ার ভেঙে জ্যোতির্ময়রূপে তোমার প্রকাশ।' এমন জ্যোতির্ময়ের আগমনে রংপুরের মানুষের হৃদয়ে যে দোলা সে দিকের উপস্থাপন

–'সংগীতের সুরঝঙ্কার জেগেছে আজ অন্তরে অন্তরে। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে প্রতিটি মানুষ আজ আনন্দাশ্রুর বন্যায় উদ্বেল। তোমার এই ক্ষণিক সান্নিধ্য আমাদের জীবনে এক পরম সঞ্চয়। কি দিয়ে স্মরণীয় করব এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে, তাই ভেবে আমরা ব্যাকুল। তোমার ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করার মতো আমাদের কিছুই নেই। একান্ত আপনজনের মতো তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয়ের স্বতোৎসারিত অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা।'

এর পরেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়েছে বাংলা ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানিদের অপশাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর সাহসী সংগ্রাম নেতৃত্বের ঘটনাবহুল অভিযাত্রার কথা। সম্বোধন করা হয়েছে–' হে মুক্তির দিশারী', বলে। সুপ্রযুক্ত এ সম্বোধন। কারণ চরম ও পরম সত্য হলো বঙ্গবন্ধুই আমাদের মুক্তির দিশারী। সেজন্য তাঁর ঋণ স্বীকার করতে হবে অকপটে। ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে মানপত্রে তা-ই করা হয়েছে–'তোমার বজ্রকণ্ঠে আমরা শুনেছি মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান, স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, মুক্তি সংগ্রামের ঝঞ্ঝামুখর দিনগুলোতে তোমার সুমহান নেতৃত্ব, তোমার বলিষ্ঠতা, তোমার সাহস, তোমার মনোবল জাগ্রত বাঙালি সত্তার এক নবীন দুর্জয়তার প্রতীক। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে তোমার উদাত্ত আহ্বানেই সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালি অস্ত্রধারণ করেছিল। ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করেছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। তোমার দেশপ্রেম বহ্নিশিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি বাঙালি মুক্তি সংগ্রামীর হৃদয়ে। তাই তারা ঝঞ্ঝার উদ্যমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মরণজয়ী সংগ্রামে। রক্তের নদী পাড়ি দিয়ে বহু জীবনের বিনিময়ে তাঁরা অবশেষে দেখে রক্ত সূর্যের উদয়।' বঙ্গবন্ধুর জন্যই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। এ সত্য যে বলতেই হবে। মানপত্রে সে কথা–'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। হে বন্ধু, তোমার সংগ্রামী প্রেরণাই সাড়ে সাত কাটি বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তুমি বিজয়ী, তুমি এক নবীন রাষ্ট্রের মহান স্রষ্টা, বাঙালি জাতির জনক।'

বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলার তেমনি বিশ্বের। বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির দূত। শোষিত মানুষের আশার আলো, সংগ্রামের উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি বিশ্বের বিস্ময়। বিশ্বজুড়ে তাঁর জন্য সাজানো বরণডালা। এমন সত্য মেনেই বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করা হয়েছে–'হে বিশ্ববরেণ্য,'–বলে। এরপর যুক্তি নির্ভরতায় তুলে ধরা হয়েছে সত্য। 'বিশ্বের মানুষের কাছে তুমি এক পরম বিস্ময়। কোন জদুকরী শক্তির বলে তুমি এক বিশাল সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন করে বাংলাদেশকে এক বাস্তব সত্যে পরিণত করলে, তা ভেবে বিশ্ববাসী বিস্ময়াবিষ্ট। তোমার বিজয়, বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবসভ্যতার বিজয় তোমার বিজয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য-সুন্দরের বিজয়; তোমার বিজয় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়। এশিয়া-আফ্রিকার বুকে সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের এ অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুমি স্থাপন করেছ। বিশ্বের নির্যাতিত শোষিত মানুষের কাছে তুমি সংগ্রামের এক উজ্জ্বল প্রতীক। বিশ্ব শান্তির তুমি এক নবীন পথিকৃত।'

নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– তাঁর সাফল্য বাংলার মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, আর দুর্বলতা বা ব্যর্থতা সেও বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। অতলান্ত ভালোবাসা নিয়েই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ, এখন সংগ্রাম দারিদ্র্যবিমোচন, স্বনির্ভরতা অর্জনের সংগ্রাম। রংপুরের মানুষের একান্ত নিকটজন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১এর ৩রা মার্চ জীবন দিয়েছেন কিশোর শংকু সমজদার। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ তিনি। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৮শে মার্চ যার যা আছে তাই নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণ করেছিলেন রংপুরের সাহসী জনতা। কয়েকশ মানুষ জীবন দিয়েছেন, মুক্তির পথ অন্বেষণ থেকে সরে দাঁড়াননি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দুর্বার লড়াই করে, অনেকের জীবনের ও আব্রুর বিনিময়ে স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন রংপুরের জনগণও। এ অঞ্চলের মানুষ জানে রংপুরের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর শুভদৃষ্টি আছে, তারপরও আপনজনের কাছে আন্তরিক কিছু প্রত্যাশার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে মানপত্রটিতে। 'হে জাতির জনক' সম্বোধন করে তুলে ধারা হয়েছে মানবিক ভালোবাসার কথা। যেমন–'আমরা জানি, তুমি দেশের জনগণকে আপন প্রাণের চেয়েও ভালোবাসো। ... আমরা কোনো কথা বলার আগে তুমি তোমার দরদি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করো আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা।' এমন যখন উপলব্ধি তখন তো দাবি করবার প্রশ্নই আসে না। যেজন্য শুধু সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ– 'কোনো কিছুই আমারা দাবি করব না বৃহত্তর স্বার্থে। শুধু কয়েকটি বিষয়ের দিকে আমরা তোমার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

মোস্তফা তোফায়েল হোসেন বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন– 'আমরা লক্ষ করি যে, মানপত্রটিতে রংপুরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি অত্যন্ত সাবলীল ও সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছিল।' প্রথম দাবি পাটকল স্থাপনের–'তুমি জানো, রংপুর জেলা পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তাই এখানে অন্তত দুটি পাটকল স্থাপিত হলে, এখানকার বিপুল পাট ও শ্রম সম্পদকে কাজে লাগানো যেতে পারে।' এরপর আছে আখের প্রসঙ্গ–'আখ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এ জেলাতে আরো চিনিকল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে নীলফামারী মহকুমার দারওয়ানীতে আরদ্ধ চিনির কলটি নির্মাণকার্য সমাপ্ত করার জন্য তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' তুলা চাষেও উত্তরাঞ্চলের যে বিপুল সম্ভাবনা সে দিক নিয়ে লেখা হয়েছে–'রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তুলা উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রংপুরে একটি তুলা গবেষণাগার আছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশের মোট প্রয়োজনের ৫০ ভাগ চাহিদা মিটবে। বিষয়টি জরিপ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাই।' মানপত্রটিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে এ অঞ্চলে উৎপাদিত বিপুল আদা প্রক্রিয়াজাতকরণে কারখানা স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তিস্তা প্রকল্প ত্বরিত বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়– 'এ প্রকল্পটি বহুদিন যাবৎ অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা চাই রংপুরেই তিস্তা প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু হোক এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান করা হোক। ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা-ধরলা ভাঙন থেকে হারাগাছ-কাউনিয়া-কুড়িগ্রাম-চিলমারী বন্দর রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প কার্যকরী করা প্রয়োজন।'

কাচ এবং দুগ্ধজাত শিল্প স্থাপনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলা হয়েছে–'রংপুরে উৎকৃষ্ট শ্রেণির বালু পাওয়া যায়। এখানে কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে, এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। গাইবান্ধায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানে দুগ্ধজাত দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করা সম্ভব।'

একটি অঞ্চলের উন্নয়ন গতি ত্বরান্বিত হয় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। সদ্য-স্বাধীন দেশে রংপুর অঞ্চলও ছিল বিধ্বস্ত, সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিচ্ছিন্ন রাস্তাঘাট। এ সময় রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে সহজ যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন। রাস্তা, সেতু নির্মাণের দিক তুলে ধরা হয়েছে মানপত্রে।' একথা তুমি জানো যে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার দাবি বহুদিনের। বর্তমান জনদরদি সরকার এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। আমরা চাই রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর প্রস্তাবিত সেতুটি ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদে করা হোক। রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে পাকবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত তিস্তাসেতু এবং বুড়িমারী-লালমনিরহাট রেলপথ অতিসত্বর মেরামত করা দরকার।' জেলার অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহ পাকা করা, পাকবাহিনী কর্তৃক দমদমা বিধ্বস্ত পুল পুনর্নির্মাণের আবেদন জানানো হয়েছে। রংপুরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও উপস্থাপিত হয়েছে।

শিশুদের প্রিয় বঙ্গবন্ধু

এরপরই আছে রংপুরের শিক্ষা প্রসঙ্গ। উচ্চ শিক্ষার জন্য তখনই চাওয়া হয়েছে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড, কৃষি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রতিষ্ঠানের সাথে পাকবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে আর্থিক মঞ্জুরির জন্য আবেদন জানানো হয়েছে–'এ এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য শহর উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ রংপুরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কৃষি কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। এতদসহ ৫০০ বেডের একটি হাসপাতালসহ রংপুর মেডিকেল কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য আমরা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ জেলার বেসরকারি স্কুল কলেজগুলোর বর্তমান আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পাকবাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত। অতিরিক্ত আর্থিক মঞ্জুরি দান করে, এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা আকুল আবেদন জানাই।'

কৃষক-শ্রমিক-মজুর-জেলে-তাঁতি সবার জন্যে অপার দরদ ছিল বঙ্গবন্ধুর। তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ও কষ্ট লাঘবে সমবায়ের ভাবনা ভেবেছেন। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটাবার পথ হিসেবে বাংলাদেশে সমবায়ের ভাবধারা বাস্তবায়নের প্রয়াসও অব্যাহত রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। রংপুরের শ্রমজীবী মানুষদের সার্বিক সংকট চিত্র তুলে ধরে তা সমাধানের পথ করে দেবার আবেদন জানানো হয়েছে মানপত্রটিতে। এমন প্রসঙ্গ–'বর্তমান জনগণতান্ত্রিক সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে সমবায়কে শক্তিশালী করার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই। রংপুর জেলার কৃষকরা দীর্ঘকাল ধরে অর্থনৈতিক শোষণের চাপে সুদ সমেত প্রায় সোয়া কোটি টাকা সমবায় ঋণে জর্জরিত। কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এ জেলায় বহুসংখ্যক অনুপযুক্ত পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প সরবরাহ করে কৃষকদের ঋণগ্রস্ত করেছে। এসব বকেয়া ঋণ পরিশোধ করা কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। তাই আমাদের আবেদন, এ বিষয় দুটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে, অন্ততপক্ষে এ জেলার বকেয়া সমবায় ঋণ ও কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণের সকল সুদ মওকুফ করে দিয়ে, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের রক্ষা করা হোক।' চাওয়া হয়েছে সমবায়ভিত্তিক ন্যায্যমূল্যের দোকান, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ।

মাত্র স্বাধীনতা লাভকারী একটি দেশ বাংলাদেশ শাসনতান্ত্রিক সাফল্য পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য ও দুরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই। প্রশংসা কথা মানপত্রে– 'আমরা জানি, মাত্র চার মাস সময়ে একটি নবীন রাষ্ট্রের পূর্ণ শাসনব্যবস্থা চালু করে তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। তোমার মহান নেতৃত্বের গুণে এত বড়ো দুরূহ কাজ সম্ভব হয়েছে। রংপুর জেলার আইনশৃঙ্খলার উন্নতির কাজ বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য আমরা তোমাকে অনুরোধ জানাই।'

সব মহকুমা জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। প্রসঙ্গটি এনে সেই ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুরকে বিভাগে রূপান্তর করার নিবেদন জানানো হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে। মানপত্রে বলা হয়েছে–'আমাদের আবেদন, রংপুরকে কেন্দ্র করে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হোক। বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হলে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলে এক নবযুগের সৃষ্টি হবে।' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে ব্যাহত হয় বিভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম। সাম্প্রদায়িক সরকার রংপুরে বিভাগ বাস্তবায়ন করেনি। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুরকে বিভাগের মর্যাদা প্রদান করেন ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি।

বঙ্গবন্ধু বারবার শোষণহীন, মানবিক মর্যাদাময় সমতাভিত্তিক এক সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। এজন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে সমাজতন্ত্রের ভিত রচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রত্যাশা

একটাই খেটে খাওয়া মানুষসহ সবার মুখে ফুটবে অমলিন হাসি। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে মানপত্রে চাওয়া হয়েছে– 'সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে শোষিত জনসাধারণের মনে যে আশার সঞ্চার করেছ তা ফুলে-ফলে বিকশিত হোক। দেশের কৃষক-শ্রমিক, মজুর-তাঁতি, জেলে-মাঝি, ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-বুদ্ধিজীবীসহ সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠুক।' বঙ্গবন্ধুর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে জোর সমর্থন জানিয়ে বলা হয়েছে– 'একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে এ কথা উপলব্ধি করেই তুমি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার বিরল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছ। তুমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ, তজ্জন্য আমাদের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন।'

মানপত্রটির উল্লেখযোগ্য অংশ হলো তাঁর জীবন সম্পর্কে সংশয়। বঙ্গবন্ধু অজাতশত্রু ছিলেন না। যে দেশের স্বধীনতার জন্য, মানুষের কল্যাণ ভাবনায় ত্যাগ করেছেন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সে দেশেরই কিছু স্বার্থপর, লোভী, ঘৃণ্য মানুষরূপী পশুরাই বিস্তৃত করেছে ষড়যন্ত্রের জাল। স্বাধীনতা বানচাল করার ষড়যন্ত্রের শঙ্কা মানপত্রটিতে– 'বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করার চক্রান্ত এখনও শেষ হয়নি। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ যে কোনো চক্রান্তই হোক না কেনো দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন হলে আমরা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি। তোমার নির্দেশিত পথই আমাদের পথ।'

শেষে মানবিক আবেগময় এক পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে যথাযথ ভাষায়। রংপুরের মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রয়েছে অপার ভালোবাসা। একই ধারায় রংপুরের মানুষও বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছেন বিপুল গভীরতায়। যাকে ভালোবাসা যায় তাঁকেই তো নিবেদন করা যায় প্রাণ খুলে। 'আমাদের প্রতি রয়েছে তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই তোমাকে মনের কথা অকপটে বলতে দ্বিধা নেই। অনেক শহিদের রক্তবিন্দু আজও মুছে যায়নি রংপুরের মাটি থেকে। অনেক স্বামীহারা, ভ্রাতৃহারা, কন্যাহারা মা-বোনেরা কান্নায় দিশেহারা আজ। রক্তাক্ত পবিত্র মাটিতে এখনও জাগে অশ্রুর শিশির।' বঙ্গবন্ধুর মতো বিশ্ববরেণ্য নেতাকে বরণ করার প্রাচুর্য যতই থাকুক না কেন, স্বস্তি মেলা ভার। এমন ভাব মনে জমাট। সে বোধ থেকেই বিনয়াবত উচ্চারণ–'কাছে পেয়েও তোমার মতো বিশ্ববরেণ্য নেতাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে পারলাম না। আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। একান্ত আপনজন হিসেবে তুমি আমাদের ক্ষমা করো।' মানপত্রটি শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কুশল কামনায়। যেমন–'তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করে বাংলাদেশের সেবা করো, পরম করুণাময়ের কাছে এই কামনা করি।'

মানপত্রটির মূল বক্তব্য শেষে ডানে লেখা– তোমারই গুণমুগ্ধ, রংপুর জেলার অধিবাসীবৃন্দ, মাঝে লেখা– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাঁয়ে লেখা– রংপুর কালেক্টরেট ময়দান, ১১ই মে, ১৯৭২ (২৮শে বৈশাখ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)। বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে প্রদানকৃত মানপত্রটি এটি ঐতিহাসিক দলিল। এ মানপত্রে রংপুরের সার্বিক উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃষ্টি কামনা করা হয়েছে। কুচক্রীদের নিষ্ঠুরতায় বঙ্গবন্ধু বেশিদিন দেশ পরিচালনার সুযোগ পাননি। যদি সুযোগ পেতেন তবে রংপুরের উন্নয়নধারা বেগবান করতে রংপুরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তাঁর আন্তরিক প্রয়াসের পূর্ণ পরিচয় মিলত। তবুও ব্রিজ, কালভার্ট মেরামত, নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ, সমবায় পদ্ধতির বিস্তার, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ অনেক দাবি পূরণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। এখন বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত কর্ম বাস্তবায়ন করছেন তাঁর যোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রংপুরের কৃষি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আদা প্রক্রিয়াজাত শিল্প, পাটকল, ব্রহ্মপুত্র নদে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ সেতু নির্মাণসহ যা কিছু আজও বাস্তবায়ন হয়নি, মানপত্রটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিগোচর করা গেলে তা হয় তো সহজেই রূপলাভ করবে। কারণ রংপুরের উন্নয়ন দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সংগ্রাম করছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের, উন্নত দেশের মর্যাদায় বিশ্বে মাথা উঁচু করে বাঁচবার জন্য। বিশেষ করে জাতির পিতার আরাধ্য সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁর দিনান্ত পরিশ্রম। রংপুর উত্তরবঙ্গের জনগণের রক্ষাকবচ, তাই রংপুরের উন্নয়ন বিশেষ জরুরি। মানপত্রে এখন থেকে ৪৮ বছর আগে জাতির পিতার কাছে রংপুরের উন্নয়ন কর্মধারা বাস্তবায়নের আশা নিয়ে সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। হয়তো বঙ্গবন্ধুর কাছে সংরক্ষিত ছিল এটি। সব দিক বিবেচনায় এ মানপত্রটিকে রংপুরের মানুষের সার্বজনিক আকাঙ্ক্ষার দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। ধন্যবাদ মানপত্র রচয়িতা ও উপস্থাপক একুশে পদকপ্রাপ্ত সাহিত্যিক অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে, এবং এটি রচনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদেরকে।

[মানপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে– মোস্তফা তোফায়েলের *বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস* গ্রন্থে। প্রকাশক মুকুল মোস্তাফিজুর রহমান, বর্ণসজ্জা, স্টেশন রোড, রংপুর। প্রকাশকাল– সেপ্টেম্বর-২০১১খ্রি.]

লেখক: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

বঙ্গবন্ধু উপাধির ৫২তম বর্ষ স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ

১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদানের ৫২ বছর পূর্তির দিন। এই দিনে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দিবসটি স্মরণে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম ও ডাটাকার্ড প্রকাশ করেছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তাঁর দপ্তরে এ উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ও ১০ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন। এছাড়া ৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটাকার্ড উদ্‌বোধন করা হয়। তিনি এ সংক্রান্ত একটি সিলমোহর ব্যবহার করেন।

মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার নয়নমণি, বঙ্গশার্দুল, অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালির মুক্তিদাতাসহ বিভিন্ন নামে ভূষিত করা হলেও অর্পূণ ছিল জাতির পিতার উপাধি। আর সে অপূর্ণতা পূরণ হয় ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। আর ইতিহাস হয়ে গেল সেদিনের তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত গণসংবর্ধনা সমাবেশ। আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি লাভের পর রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া সে গণসংবর্ধনায় দশ লাখেরও বেশি মানুষের উপস্থিতিতে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ঘোষণা করেন 'আজ থেকে তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'।

প্রতিবেদন: খালেদ হোসেন

বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা: ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

শহীদুল হক স্বপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম ব্রিটেনে আসেন ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অল্প ক'দিনের সফর হলেও শেখ মুজিব প্রবাসী বাঙালিদের সংস্পর্শে এসেই বুঝতে পারেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনার জন্য ব্রিটেনই হবে সবচেয়ে ভালো জায়গা। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটেন প্রবাসী বাংলাদেশি ও সেখানে পড়তে আসা ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনে গেলে বার্মিংহামের ডিগবেথ সিভিক হলে মিডল্যান্ড আওয়ামী লীগ ও ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট-ইপিএলএফ-এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয়

বঙ্গবন্ধু ব্রিটেন সফরে আসেন দ্বিতীয়বার ১৯৫৮ সালের জুন মাসের শেষের দিকে। তৃতীয়বার আসেন ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে। সেই সফরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন প্রবাসী নেতা জাকারিয়া চৌধুরীর অনুরোধে লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান হাউসে যান এবং সেই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ইস্ট পাকিস্তান হাউস এক সময় দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে অংশীদার হবে এবং তিনি এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন বলে আশ্বাস দেন। ইস্ট পাকিস্তান হাউস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তা হিসেবে ছিলেন জাকারিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার এম আমির-উল-ইসলাম এবং আজিজুল হক ভূঁঞাসহ আরো অনেকে।

চতুর্থবার বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনে আসেন ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করলে ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছুটে আসেন লন্ডনে। এটিই ছিল তাঁর প্রথম সাংগঠনিক সফর। যদিও তখনো ব্রিটেনে আওয়ামী লীগের কোনো দলীয় কার্যক্রম ছিল না। তবে ঐতিহাসিকভাবে এই সফরের গুরুত্ব অনেক। বঙ্গবন্ধুর সেই সফর ছিল আগরতলাকে ব্যবহার করে গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনাকে পাকাপোক্ত করা। ১৯৬৪ সালের এই সফরে বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনের তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দেখা করেন।

১৯৬৪ সালের পর উনসত্তর সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ব্রিটেন সফর করেননি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। সেই থেকে বাঙালি বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের আর একসঙ্গে থাকা হবে না। তা নিয়ে ব্রিটেনে বাঙালি ছাত্র-শ্রমিক সংগঠনসহ বিভিন্ন মহলে আলোচনা হতে থাকে। ছেষট্টি সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণা ব্রিটিশ বাঙালিদের ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে এবং ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠিত হয়।

১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হলে ব্রিটিশ বাঙালিরা তার প্রতিবাদ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য জাকারিয়া চৌধুরী, মিনহাজ উদ্দিন ও আজিজুল হক ভূঁঞা চাঁদা তুলে আইনি লড়াইয়ের জন্য ব্রিটিশ আইনজীবী নিয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করেন।

উনসত্তর সালে গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলনের ঢেউ খেলে যায় ব্রিটেনেও। বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলে অক্টোবর মাসে তিনি ব্রিটেনে যান। ব্রিটেনে বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি সভা করার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগের অনুসারীদের মধ্যে কোন্দল থাকায় লন্ডনে কোনো সভা করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগের তখনো কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট নেতা জগলুল পাশা ও আজিজুল হক ভূঁঞার নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ নেতা গাউস খান ও তছাদ্দক আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে বার্মিংহামে ডিগবেথ সিভিক হলে বঙ্গবন্ধুকে গণ-সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ছয় দফা নয়, দাবি হবে এক দফা প্রবাসী বাঙালিদের এমন দাবির প্রতি বঙ্গবন্ধুর সমর্থনেই প্রবাসী ছাত্র-জনতা প্রস্তুতি নিতে থাকে স্বাধীনতা প্রক্রিয়ার জন্য।

১৯৭০ সালে গাউস খান ও তছাদ্দক আহমেদের নেতৃত্বে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের পর পূর্ব বাংলার বানভাসি মানুষকে সাহায্য করতে যুক্তরাজ্যের বাঙালিরা চাঁদা তুলে সাহায্য করে এবং সত্তরের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ আর্থিক সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্ত ও বাঁকে জড়িয়ে

আছে প্রবাসীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আর তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ১৯ বছরে সাতবার ছুটে যান প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে।

১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত মূলধারার রাজনীতি ও নেতৃত্বের সমান্তরালে তরুণ প্রজন্মের রাজনীতিও ছিল স্বাধীনতার স্বপ্নের অংশীদার। নিরাপত্তাজনিত কারণে সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড অন্তরালে থাকলেও স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা ছিল তুলনামূলকভাবে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ।

ষাটের দশকে গোপন সংগঠনগুলোর উদ্ভব ঘটে। নানা উৎস থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি পাওয়া যায়, বিশেষ করে পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে এমন অন্তত ছয়টি সংগঠন ছিল। যেমন: মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর 'ইনার গ্রুপ', আলী আসাদের 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন পার্টি', কাজী জাফর আহমেদের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলভিত্তিক 'বেঙ্গল লিবারেশন অ্যাসোসিয়েশন', হারুন-উর-রশিদের 'বঙ্গবাহিনী', আবদুল আজিজ বাগমারের 'অপূর্ব সংসদ' এবং সিরাজুল আলম খানের ইকবাল হলভিত্তিক (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) 'নিউক্লিয়াস বা ছাত্রলীগের স্বাধীনতা গ্রুপ'। শেষোক্ত দুটি সংগঠনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি কিন্তু গোপন যোগাযোগ ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের স্লোগান 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' নিউক্লিয়াস রচিত ছিল; এমনকি পরবর্তী সময়ের 'জয় বাংলা' স্লোগানও ছিল তাদের।

লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি শিক্ষার্থীরাও এমন দুটি সংগঠন তৈরি করেছিল। যেমন- জাকারিয়া চৌধুরীর 'উত্তরসূরি' এবং আজিজুল হক ভূঁঞার 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট'। দ্বিতীয় সংগঠনটি ২৯শে নভেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা

১লা আগস্ট ১৯৭১, লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁঞা

ঘোষণা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম দৃষ্টান্ত। এই ঘোষণার বাস্তব গুরুত্ব না থাকলেও এর প্রতীকী তাৎপর্য স্বীকার্য।

[তথ্যসূত্র: *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের লেখা নিবন্ধ থেকে সংগৃহীত]

সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে গঠিত হয় 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট'। আব্দুস সবুর চৌধুরী সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আজিজুল হক ভূঁঞা। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হলে ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালি জাকারিয়া চৌধুরী, মিনহাজ উদ্দিন, আজিজুল হক ভূঁঞা বাঙালি সম্প্রদায়কে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য ব্রিটিশ আইনজীবী নিয়োগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রেরণ করেন।

১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের পর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে অক্টোবর ৩ সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে ব্রিটেনে আসেন। সেসময় বার্মিংহামের ডিগবেথ সিভিক হলে মিডল্যান্ডস আওয়ামী লীগ ও ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (ইপিএলএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

একদিকে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য দর কষাকষি করছেন অন্যদিকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতিও চলছিল ব্রিটেনে। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট ১৯৭০ সালের ২৯শে নভেম্বর বার্মিংহাম শহরের ডিগবেথ সিভিক হলে একটি জনসভার আহ্বান করে। সেই সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রকাশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। সভায় কয়েক হাজার বাঙালির সমাগম হয়েছিল বলে জানা যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক নেতা তারিক আলী সেই সভায় বক্তৃতাকালে বলেন, 'The step taken by the East Pakistan Liberation Front will be an example to the whole of Asia.' তিনি আরো বলেন, 'During the British rule in India, it was commonly said that- what Bengal thinks today, India thinks tomorrow.' সভার সভাপতি ও ইপিএলএফ-এর আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁঞা অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান। ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট প্রকাশ্যে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন।

মার্চ মাসের শুরুতে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বাংলার মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অস্ত্র। আর সেই অস্ত্র ক্রয়ের জন্য চাই অর্থ। তাই বিলাতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিটি সংগঠন তখন থেকেই যার যার মতো করে অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

মার্চের পর থেকে সারা ব্রিটেনের বিভিন্ন নগরে-বন্দরে অ্যাকশন কমিটি আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। বার্মিংহামের 'ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট' নাম পরিবর্তন করে হয়ে যায় 'বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি'।

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর নির্যাতন এবং নৃশংসতার প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৫ই মার্চ ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট-ইপিএলএফ ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। সেদিন লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে ইপিএলএফ-এর সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক ভূঁঞা, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা সুলতান মাহমুদ শরীফ এবং অন্যান্যরা পাকিস্তান হাই কমিশনের পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে দেন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

২৮শে মার্চ স্মলহিথ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ নেওয়া হয় এবং বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

উত্তোলন করা হয়। ২৭শে মার্চ রাতে আজিজুল হক ভূঁঞা'র দেখিয়ে দেওয়া নকশায় বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করা হয়। ২৮শে মার্চ স্মলহিথ পার্কে পতাকা উত্তোলন করেন জনৈক মিসির আলী। সেই জনসভায় আজিজুল হক ভূঁঞা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক লক্ষ রাইফেল কিনে দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং তা-কিনে জুন ১৯৭১-এ কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে অ্যাকশন কমিটি গড়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর উপস্থিতিতে এবং লুলু বিলকিস বানুর সভাপতিত্বে ২৪শে এপ্রিল কভেন্ট্রি সম্মেলনের মাধ্যমে সকল সংগ্রাম কমিটিগুলোকে একত্রিত করে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট Steering Committee of the Action Committees for Liberation of the People's Republic of Bangladesh in UK-1971 কমিটি। উক্ত কমিটি পরিচালনা করার জন্য আজিজুল হক ভূঁঞাকে আহ্বায়ক, শেখ আব্দুল মান্নান, কবির চৌধুরী, শামসুর রহমান ও মনোয়ার হোসেনকে সদস্য করা হয় এবং গঠিত কমিটি ১১ গোরিং স্ট্রিটে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহিঃর্বিশ্বে ব্যাপক জনমত গঠনে নিয়োজিত হয়।

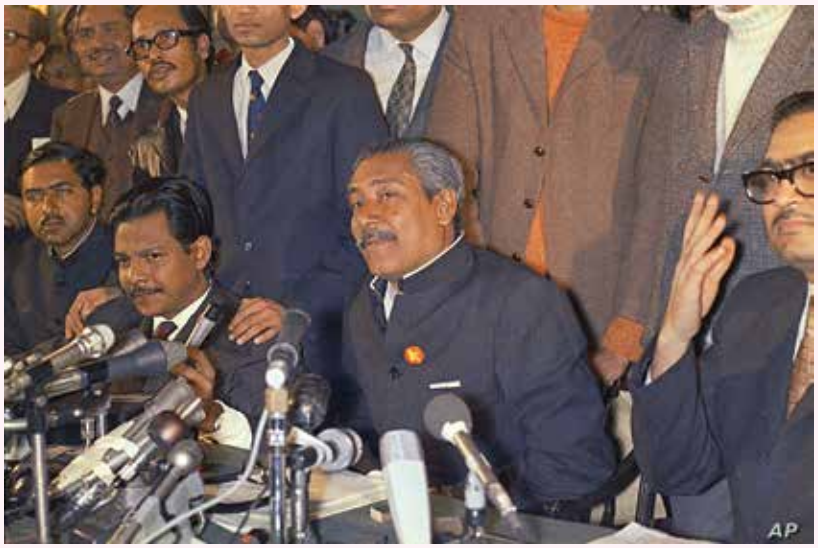

৮ই জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে বিশ্ব গনমাধ্যমের সামনে সংবাদ সম্মেলন করছেন

১৯৭১ সালের জুন মাসে আজিজুল হক ভূঁঞা মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগতভাবে মুজিবনগরে আসেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুনরায় ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে সংগ্রামে যোগদান করেন।

১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালিদের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগ করা। এ কাজে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক আজিজুল হক ভূঁঞাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যার যার অবস্থান থেকে ব্রিটিশ এমপি, মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে গেলে সেখানে স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সকল ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসলে ১৮ই জানুয়ারি আজিজুল হক ভূঁঞা বাংলাদেশে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আজিজুল হক ভূঁঞা বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চষে বেড়িয়েছেন ব্রিটেনের রাজপথে, অর্থ সংগ্রহ করেছেন, সভা-সমাবেশ করে বিশ্ব জনমত গঠনে কাজ করেছেন নিরলসভাবে। ২০০৬ সালে এই দেশপ্রেমিক নেতার মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল, খণ্ড ৪-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিদের অবদান লেখা আছে। এতে আজিজুল হক ভূঁঞার অবদানের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন তিনি।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল ৪র্থ খণ্ড, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি'

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

কমনওয়েলথের সেরা তিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

মহামারি করোনাভাইরাস সফলতার সঙ্গে মোকাবিলার স্বীকৃতি হিসেবে কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের সরকারপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী তিন নারী নেতাদের তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমনওয়েলথ মহাসচিব পেট্রোসিয়া স্কটল্যান্ড কিউসি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১' ৪ঠা মার্চ এক বিশেষ ঘোষণায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে করোনাকালে 'অসাধারণ নারী নেতৃত্ব ও গভীর অনুপ্রেরণাদায়ী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি অনেক নারী এবং মেয়ের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তারপরও আমাদের কমনওয়েলথের তিনজন বিস্ময়কর নেতার নাম বলতে চাই– নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরতেন, বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রী মিয়া আমোর মোটলে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই তিন নেতা করোনাকালে যার যার দেশে নিজ নিজ ভূমিকায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন কমনওয়েলথ মহাসচিব।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

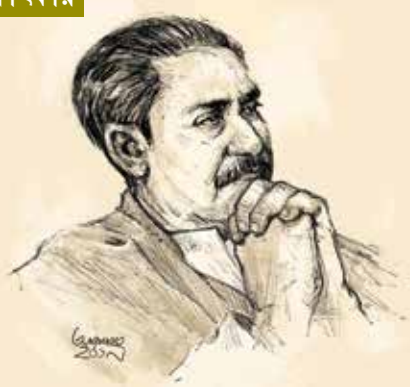

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

[ড. দেলোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দি ইস্ট এশিয়া সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৯-২০১২ সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক স্কলার হিসেবে জাপান থেকে মাস্টার্স এবং মনবুকাগাকুসু স্কলার হিসেবে জাপান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, বিশ্বায়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও শান্তি বিষয়ে গবেষণা করেন। তিনি ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে পঞ্চাশটিরও অধিক গবেষণা গ্রন্থ, গ্রন্থ চ্যাপ্টার ও গবেষণা প্রবন্ধ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি সম্প্রতি Covid-19 Global Pandemic and Some Aspects of Human Security in South Asia শিরোনামে একটি গ্রন্থ (Pentagon Press, New Delhi, 2020) যৌথভাবে প্রকাশ করেন এবং Bangladesh: East Asia Relations: Changing Scenarios and Evolving Linkages শিরোনামে গ্রন্থ সম্পাদনা করেন (East Asia Study Centre, Dhaka University, 2019)। তিনি নিয়মিত টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।]

প্রফেসর ড. দেলোয়ার হোসেন

এম এ খালেক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে করেন?

অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যে ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন তার আর্কিটেক্ট হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইংল্যান্ড এবং ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দেশে এসে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে ভাষণ দান করেন? সেখানেও ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে দুটো বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। এগুলো ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি বা ফাউন্ডেশন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধু অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার বলেছেন, বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। এছাড়া বঙ্গবন্ধু বলতেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কাঠামোই হবে, 'সবার প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়'। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু মুখেই এ কথা বলেননি। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বা বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তি কী হবে তার একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেসব মৌল নীতি অনুসরণ করা হবে, তাহলো– জোটনিরপেক্ষতা, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যে সমস্ত দেশ বা জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হচ্ছে তাদের সমর্থন দেওয়া। এছাড়া কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৭০-এর দশকে জোটনিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ কেমন হবে তা বঙ্গবন্ধু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলেছেন, 'বিশ্ব আজ দুটি শিবিরে বিভক্ত। একটি হচ্ছে শোষক আর একটি হচ্ছে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' তিনি বার বারই বলেছেন, বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। বাংলাদেশ কারো সঙ্গে বৈরিতা সৃষ্টি করবে না। তবে বাংলাদেশ সর্বাবস্থায় তার স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা বেশ কঠিন কাজই ছিল। সেই সময় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে শত্রুতা নয় এমন উচ্চারণ করা বেশ সাহসী কাজ ছিল। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এমন সাহসী কথা উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ বৈরী পরিস্থিতিতে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। আবার সেটাকে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক কাঠামো তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধু যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছেন– তা এখনো সমকালীন।

এম এ খালেক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কেমন হবে তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু কী বলতেন? তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়ন কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন: পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যখন লন্ডন গমন করেন তখন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি কী ধরনের সাহায্য চান বা বাংলাদেশের ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা কী হবে? বঙ্গবন্ধু

তখন বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে। তারা সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মানুষ যে ধরনের নিপীড়ন সহ্য করেছে তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের পাশে দাঁড়ানো। বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে একটি সর্বজনীন মানবতার সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জাতিসংঘে বলেন, 'The very struggle of Bangladesh symbolized the universal struggle for peace and justice. It was, therefore, only natural that Bangladesh, from it very inception should stand firmly by the side of the oppressed people of the world.' (জাতিসংঘ ভাষণ ১৯৭৪)। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা চাই বিশ্ব আমাদের পাশে দাঁড়াবে। তবে তিনি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কোনো সহায়তা চাননি। শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে একটি আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছেন। বঙ্গববন্ধু তাঁর শাসনকালে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে যান জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু কেমন জাতীয়তাবাদী, আপোশহীন সংগ্রামী নেতা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আরো জানতে পারেন বঙ্গবন্ধু কেমন মানবিক গুণসম্পন্ন একজন নেতা। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো, আলজেরিয়ার হুয়ারি বুমেদিন, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ বিশ্ব নেতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারেন। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সে (ওআইসি) যোগদান করেন। ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। উল্লেখ্য, লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের একদিন আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। পাকিস্তানের নিকট স্বীকৃতি আদায় করাটা যে-কোনো বিচারেই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণদান করেন। এটি একটি মাইলফলক হয়ে আছে। জাতিসংঘের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। বলেছেন প্যালেস্টাইনিদের ওপর ইসরাইলের বর্বর নির্যাতনের কথা। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সেদিন একজন মানবতাবাদী নেতার অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতি এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথের বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এসব আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতি এবং চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু তাঁর সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশকে তিনি একটি নেতৃত্বের স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন শতভাগ সফল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা। বঙ্গবন্ধু জানতেন স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা বেশি কঠিন। তাই তিনি বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশ বিরোধিতা করে আসছিল। সেই অবস্থায় বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় করা বেশ কঠিন ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই তিনি এই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ না পেলেও অনেকগুলো বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ বাংলাদেশ লাভ করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করানোর জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি লাভের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করত। বঙ্গবন্ধু সেই ভুল ধারণা ভেঙে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির আরো একটি বড়ো সাফল্য হচ্ছে যুদ্ধাবসানের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ফেরত পাঠানো। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মিত্রবাহিনী এত স্বল্প সময়ে স্বাধীন দেশ থেকে প্রত্যাহৃত হয়নি। বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের একটি উদাহরণ দেওয়া যাবে না যেখানে মাত্র তিন মাসের মাথায় মিত্রবাহিনী স্বাধীন দেশ ত্যাগ করেছে। বঙ্গবন্ধু এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানও কম নয়। অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীকে স্বদেশে প্রেরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কূটনৈতিক

১৯৭৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অগাধ আস্থা ছিল। তাই তিনি বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা এবং কূটনৈতিক দক্ষতার অপরিসীম অবদান পরিলক্ষিত হয়।

এত অল্প সময়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন সাফল্য বিশ্বে খুব কম রাষ্ট্রনায়কেরই আছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিত করাতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তার বিরুদ্ধে সকল আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নির্মূল করতে সক্ষম হন। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহায়তা লাভ করেছেন। বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সহায়তা দেওয়ার কথা বলে সেই খাদ্য সহায়তা দেয়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করাটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। এমনকি পাকিস্তান বাহিনীর সহায়তার জন্য সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেছিল সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু সেই পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। পশ্চিমা বিশ্ব, জাপান, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জন এবং তাদের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা লাভ একটি বিরল ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে এই সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্ণফুলি নদীতে মাইন ক্লিন করার ক্ষেত্রে যেভাবে সহায়তা করেছে তা উল্লেখের দাবি রাখে। মুসলিম বিশ্ব থেকেও সাহায্য এসেছে। এমনকি চীনের সঙ্গে এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সময়ে। পরাশক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরিক করা একটি অসাধারণ অর্জন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সমুদ্র আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তখনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

এম এ খালেক: বঙ্গবন্ধু লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে যোগদান প্রশ্নে মন্ত্রিপরিষদের কোনো কোনো সদস্যের বিরোধিতা ছিল। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে যোগদানের তাৎপর্য কী?

অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন: লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদানের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও মন্ত্রিপরিষদের কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের একদিন আগেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে যোগদান না করলে পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে আরো বিলম্ব হতো। এছাড়া এই সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হন। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে যে ভুল ধারণা ছিল তা দূরীভূত হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ ছিল আবেগ বিবর্জিত এবং অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটি সিদ্ধান্ত।

বঙ্গবন্ধু যে অত্যন্ত যোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান একজন নেতা তা তাঁর পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলেই অনুধাবন করা যায়। বঙ্গবন্ধু শুধু মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেকে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনের সমস্যা থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে সব সময়ই সোচ্চার থেকেছেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দও বঙ্গবন্ধুর প্রতি খুবই আন্তরিক ছিলেন। তারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতেন। মুসলিম বিশ্বে এবং অন্যান্য কোনো কোনো দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে যে ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল বঙ্গবন্ধু তা তিরোহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, আমি হিমালয় দেখিনি আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। তাঁর এই মন্তব্যই প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কেমন ছিল।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই ছিল আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিশ্চিত করা। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তাকারী দেশগুলোর পাশাপাশি যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রতী হন। তিনি এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে সফলতা অর্জন করেছিলেন। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়' বঙ্গবন্ধুর এই পররাষ্ট্রনীতি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী। বর্তমান সরকারও বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে চলেছেন। একটি সদ্য-স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছেন। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: বিডিবিএল-এর মহাব্যবস্থাপক (অব.) ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক এম এ খালেক

মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার ও বঙ্গবন্ধুর দর্শন

কৃষিবিদ শেখ মো. মুজাহিদ নোমানী

খাদ্যশস্য উৎপাদনে যে কয়েকটি উপকরণ একান্ত প্রয়োজন, তার মধ্যে বীজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। বীজ হচ্ছে ফসলের প্রাণ। চিরন্তন সত্য হচ্ছে 'ভালো বীজে ভালো ফসল'। ভালো বীজের গুণাগুনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভালো ফসল উৎপাদন তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে খাদ্যের সংস্থান করা অর্থাৎ দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আর অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন 'মানসম্পন্ন ভালোবীজ, সার ও সেচের'। বঙ্গবন্ধু হাতে নিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও পুরাতন কৃষি অবকাঠামোসমূহ পুনর্গঠন উন্নয়ন প্রকল্প।

১৯৭৩-১৯৭৮ মেয়াদের বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় চালু করা হলো 'দানাশস্য বীজ প্রকল্প' এবং বিএডিসিকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো ধান, পাট ও গমবীজ ফসলের বীজ উৎপাদনের জন্য।

বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় অনুধাবন করেছিলেন:

ভালো বীজে ভালো ফসল, সুধী জনে কয়,
প্রত্যায়িত বীজই ভালো বীজ, জানিবে নিশ্চয়।
২০ ভাগ বেশি ফলন পাইতে হলে ভাই,
প্রত্যায়িত বীজ ছাড়া আর যে উপায় নাই।
এই বীজে আছে ভাই সকল ভালো দান,
এই বীজের ব্যবহারে বাড়বে দেশের মান।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাই ১৯৭৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড গঠনের পরপরই ১৯৭৪ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করলেন তৎকালীন 'বীজ অনুমোদন সংস্থা' যা বর্তমানে 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি'। যার অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত বীজের মাঠমান ও বীজমান যাচাইপূর্বক প্রত্যয়ন দেওয়া।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু লালন করেছেন, ধারণ করেছেন সব সময়। এই স্বপ্ন পূরণে প্রথমেই প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তিনি বলেছেন 'খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের আছে উর্বর জমি, অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ আর আমাদের পরিশ্রমী মানুষ। আর তাই ভালো জাত উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব'।

তিনি বিশ্বাস করতেন, যে দেশের ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী, সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষি, কৃষক আর কৃষিবিদদের মর্যাদার উন্নয়ন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে এসে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ঘোষণায় কৃষিবিদদেরকে সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু আরো বিশ্বাস করতেন, 'কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমিতে ফসলের ফলন যাতে বৃদ্ধি পায়

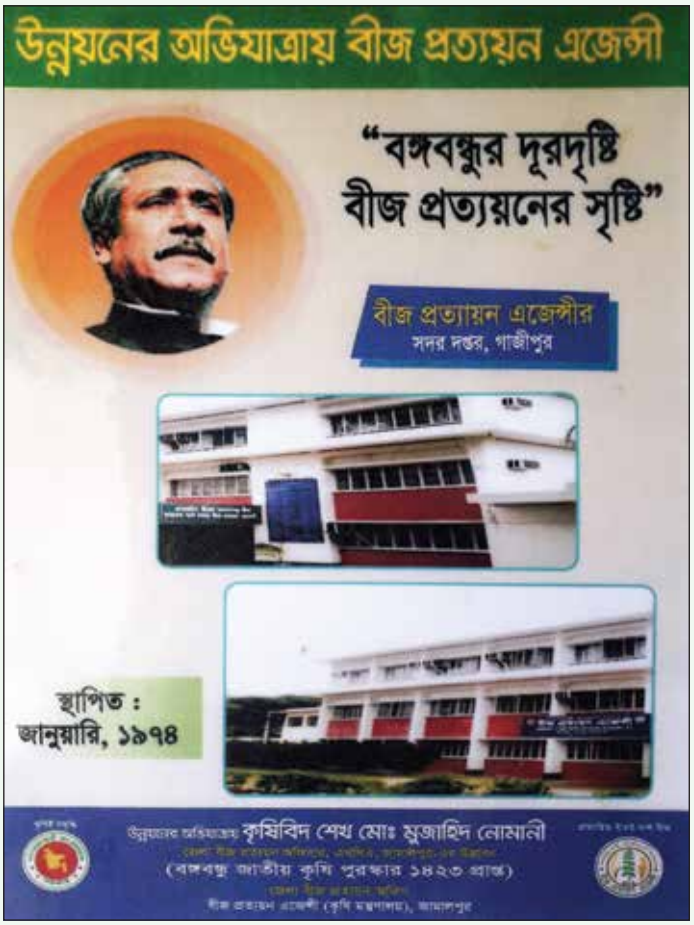

তারজন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।' তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৩ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভার প্রথম সভায় নিম্নবর্ণিত যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেন–

- দানাদার ফসল ও বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পূর্ব জার্মানি থেকে ৩৮,০০০ সেচযন্ত্র আমদানি করে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়। ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো লিফট পাম্প, ২,৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩ হাজারটি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।
- কৃষিতে কেবল বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিই নয় বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু করেছিলেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্যই বরাদ্দ করেছিলেন ১০১ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ২০ শতাংশের বেশি।

❑ বঙ্গবন্ধুর সময় গৃহীত প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ১৯৭৩-জুন ১৯৭৮) কৃষি খাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করায় তখনই দেশের সার্বিক কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

❑ তাঁর সাড়ে তিন বছরের বাস্তব শাসনামলে দেশের বাজেটের শতকরা ৩১ ভাগ অর্থ কৃষি খাতে ব্যয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাস্তব ও গতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাত্র দুই বছরের মধ্যে কৃষিতে সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৭ শতাংশ।

১৯৭১-১৯৭২ সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল মাত্র ৮৭.৫ লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে এসে সংবর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন 'বাংলার মাটির মত মাটি দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না, বাংলার সম্পদের মতো সম্পদ দুনিয়ায় পাওয়া যায় না। বঙ্গবন্ধু তাঁর এক ভাষণে বলেছেন 'বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষিবিপ্লব সাধন করুন।' ১৯৭৪-১৯৭৫ সালের বীজ অনুমোদন সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্থাপনসহ বিএডিসি ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করায় এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদন এবং সার্বিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩-১৯৭৪ সাল থেকে 'দানাশস্য বীজ প্রকল্প'-এর আওতায় বীজপ্রযুক্তি ও বীজমান নিশ্চিতকরণে বিএডিসি ও তৎকালীন বীজ অনুমোদন সংস্থার তদারকিতে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। ফলে ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছরে ৫৭৬ টন মানসম্পন্ন গমবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। ১৯৭৭-১৯৭৮ অর্থবছরে ধান, পাট ও সবজিসহ মোট বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫,০৬৬ টনে উন্নীত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আরো বলেছিলেন 'খাদ্য বলতে শুধু চাউল, আটা নয়, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারিও আছে। এই সমস্ত কৃষি ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

বঙ্গবন্ধুর এই সুদূরপ্রসারী দিক নির্দেশনা প্রদান ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে যথাযথ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করার ফলেই দেশে ধান, পাট, গম ও আলু ফসলের প্রত্যয়নকৃত বীজ উৎপাদনের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়েছে। বঙ্গবন্ধুর সেই দৃঢ়চেতা দিক নির্দেশনা আর কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদ যোদ্ধাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধান চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দেশ খাদ্য উদ্বৃত্ত ও খাদ্য রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৪র্থ থেকে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে। অব্যাহত নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে। শুধু ২০১৯-২০২০ বছরে কৃষি খাতে ৭ হাজার ১৮৮ কোটিরও বেশি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ তথা মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের প্রিয় স্বদেশ স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলায় পরিণত করে ২০৪১ রূপকল্পের মাধ্যমে 'সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা উন্নত এক বাংলাদেশ' হওয়ার পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বীজমান উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

১৯৭৪ সালে 'বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি, বীজ প্রত্যয়নের সৃষ্টি' যেমন সে সময়ে সঠিক ও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৮ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৫ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনায় বীজমান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের বীজ সেক্টর আজ সুসংহত ও বিকশিত হতে পেরেছে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের ফলে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বীজ উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বাংলাদেশের বীজ সেক্টরেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বীজ উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও বীজশিল্প উন্নয়ন খাতে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে বাংলাদেশে বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন ও বাজারজাতকরণে শুরু হয় ব্যাপক কর্মকাণ্ড। বর্তমানে প্রায় ১৫০০ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসি, ডিএইসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দানাদার ফসলের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নিয়োজিত থাকলেও তার পরিমাণ মাত্র ১৫-২০% মাত্র। তবে বীজ সরবরাহের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারি খাত মূলত উচ্চ মুনাফার বীজ যেমন হাইব্রিড ধান (৯২.৪২%), ভুট্টা (৯৮.৮৫%), পাট (৯৫.৩৭%), শাকসবজি (৯৬.২১%) এবং আলু (৭২.২৬%) বীজের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, যা বর্ণিত ফসলের বা খাদ্যের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

তাই বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার দর্শন, মানসম্পন্ন বীজের উন্নয়ন এ আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ হয়েছি। কৃষি উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করা হয় তাহলে ঐ বীজ হতে পাবো অধিক ফসল, দেশ ও জাতি হবে সুস্থ সবল।

'ভালো বীজেই সুস্থ জীবন'। সুতরাং আমাদের প্রত্যাশা– জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে আমাদের সবার এই হোক অঙ্গীকার 'মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করব, অধিক ফসল ঘরে তুলব'। এভাবেই আমরা পাবো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'। আর দেশ হয়ে উঠবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের 'সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা উন্নত এক বাংলাদেশ'। সুতরাং এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে–

বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বীজ উন্নয়নে অবদান
মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহারে বাড়ছে দেশের সম্মান।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, এসসিএ এবং সিনিয়র সহসভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ঢাকা

একজন ফায়ার ফাইটার ও একটি বাঁশের সাঁকো

মিয়াজান কবীর

মেঘনা-তিতাস নদীর পলি মাটির উর্বর ভূমি– নাম তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলায় একটি ছায়াঘেরা পাখি ডাকা সুনিবিড় গ্রাম তারুয়া। এই গ্রামে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্দিকুর রহমান। আকবর মিয়া আর সুফিয়া বেগমের পাঁচ ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। আকবর মিয়া ছেলেকে লেখাপড়ার জন্য তালশহর মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর আশুগঞ্জ আঞ্জুমান ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। আকবর মিয়া ছিলেন একজন কৃষিজীবী মানুষ। বাবাকে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে দেখে সিদ্দিকুর রহমানের কিশোর মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে। সংসারের অভাব-অনটন তাঁকে বিচলিত করে তোলে। ছোটো ছোটো ভাইবোনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে তিনি চলে যান ঢাকায়। সেখানে গিয়ে অল্প পুঁজি নিয়ে লেদার সুটকেসের ব্যাবসা শুরু করেন। এই ব্যবসায় আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছলতা আসে। তখন মা-বাবার ইচ্ছা অনুসারে ১৯৬৪ সালে লালপুর গ্রামে আবদুল হাকিম মিয়ার মেয়ে রওশন আরা বেগমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ এক পর্যায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দেশের পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য ফায়ার সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিসের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে পত্রিকায় ফায়ারম্যান নিয়োগের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির জন্য আবেদন করেন সিদ্দিকুর রহমান। সিদ্দিকুর রহমান দেখতে ছিলেন ফরসা, দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। নিয়োগ কমিটি তাকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করে নিয়োগপত্র দেন।

নিয়োগপত্র পেয়ে সিদ্দিকুর রহমান ২০শে সেপ্টেম্বর যোগদান করেন কুমিল্লা ফায়ার স্টেশনে। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন একজন ফায়ার ফাইটার হিসেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কুমিল্লার ময়নামতিতে গড়ে উঠেছিল সেনানিবাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাঁরা দেশ রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেনানিবাসের পাশেই তাঁদের স্মৃতিস্মরণে গড়ে উঠেছে ওয়ার সিমেট্রি। সিদ্দিকুর রহমান কুমিল্লায় কর্মরত অবস্থায় একজন ফায়ার ফাইটার হিসেবে জেনেছেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। দেখেছেন ওয়ার সিমেট্রি নামফলকে লেখা শহিদদের নাম-ঠিকানা। সেসব শহিদদের আত্মোৎসর্গিত বীরত্বগাথা তাঁর মনে জাগিয়েছিল দেশপ্রেম। সেই চেতনায় হয়েছিলেন উদ্ভাসিত। পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি দেশ ও জাতির রক্ষার্থে এক অকুতোভয় ফায়ার ফাইটার হিসেবে পালন করেন সাহসী ভূমিকা।

যুদ্ধ শেষে সিদ্দিকুর রহমান বদলি হয়ে চলে আসেন নিজ জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনে। তিনি ছিলেন একজন সজ্জন মানুষ। স্নেহ-মায়া-মমতায় ভরা ছিল মনপ্রাণ। তিনি ছোটো ভাইবোনদের যেমন আদর-সোহাগ করতেন, চাকরিজীবনে এসেও কনিষ্ঠ সহকর্মীদের তেমনি স্নেহ-মমতা বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে সিদ্দিকুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রওশন আরা সন্তানসম্ভবা হওয়ার দরুন ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন। পহেলা এপ্রিল তাঁর এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। বাঙালি জীবনের সাংস্কৃতিক ধারায় সন্তান জন্মের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে নবজাতকসহ স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর দিনই ছিল পহেলা বৈশাখ। বাংলার ঘরে ঘরে নববর্ষের আনন্দের ধারা বইতে থাকে। এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আশুগঞ্জের লালপুর বাজার পুড়িয়ে ছাড়খার করে ফেলে। তারপর নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগোতে থাকে।

সিদ্দিকুর রহমান দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর মামা বাড়ির খোঁজখবর নিতে খুব সকালে শালুকপাড়া গ্রামে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে তারুয়া-খোলাপাড়া রাস্তা ধরে পাকিস্তানি বাহিনী শালুকপাড়ার দিকে ধেয়ে আসছে। হানাদার বাহিনী আসার খবর পেয়ে এলাকার লোকজন ভয়ে জীবন বাঁচাতে ছুটাছুটি করতে থাকে। হতবিহ্বল লোকজন কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় আশ্রয় পাবে– এসব ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। গ্রামের মানুষ, ঘরের বউ-ঝি, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, যুবক-বৃদ্ধ যে যেদিকে পারছে আতঙ্কে ছুটে পালাচ্ছে।

সিদ্দিকুর রহমান আশৈশব ছিলেন দায়িত্বশীল, পরোপকারী। তাছাড়া এখন তিনি একজন প্রশিক্ষিত ফায়ার ফাইটার। তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে এবং একজন মানবসেবা কর্মী হিসেবে ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি ছোট্ট খাল পাড় হয়ে মানুষজন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারছে না। একথা ভেবে খালের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন খালের পানিতে অনেকগুলো বাঁশ ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। সিদ্দিকুর রহমানের রয়েছে ফায়ার সার্ভিসে অগ্নিনির্বাপনসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়ে অসহায় মানুষকে উদ্ধার করা, সেতু নির্মাণ এমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ। তিনি অসহায় মানুষের জীবনের কথা চিন্তা করে খালের পানিতে ভাসমান বাঁশ দিয়ে একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন। যাতে এই সাঁকো দিয়ে খাল পাড় হয়ে এলাকার বিপদগ্রস্ত মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা ভয়ার্ত মানুষ অনেকে এই বাঁশের সাঁকো পাড় হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সক্ষম হয়। এলাকার লোকজনকে পালাতে দেখে হানাদার বাহিনী তাদের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। একসময় এই

মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতন

বাঁশের সাঁকো পাড় হয়ে শালুকপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে হানাদার বাহিনী। হানাদার বাহিনীকে বাঁশের সাঁকো পাড় হতে দেখেই সিদ্দিকুর রহমান তাঁর মামা জারু মিয়া ও সাদেক আলি একটি ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করেন। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের অবস্থান বুঝতে পেরে ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে তিনজনকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে এসে বেধড়ক মারপিট করতে থাকেন। তারপর তিনজনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু রাইফেলটি অকেজো ছিল বিধায় ট্রিগার চেপে ব্যর্থ হয় হানাদার বাহিনী। এই সুযোগে জারু মিয়া সিদ্দিকুর রহমানকে পালাতে ইঙ্গিত দিয়ে দৌড়ে একটি পুকুরের পানিতে আত্মগোপন করেন। সিদ্দিকুর রহমানও জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করেন। তখন পাশের অন্য এক সৈনিক রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়ে। সেই রাইফেলের গুলি সিদ্দিকুর রহমানের পিঠে লেগে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সিদ্দিকুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন মাটিতে। সিদ্দিকুর রহমানের শরীর থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তাঁর বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় সবুজ বাংলার শ্যামল মাটি।

হানাদার বাহিনী জঙ্গিবিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে গ্রামগঞ্জে, হাটবাজারে। বিধ্বস্ত হয় ঘরবাড়ি, দোকান-পাট। নিহত হয় নিরীহ জনসাধারণ। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে লাশের পর লাশ। এ করুণ দৃশ্য দেখে এলাকার ভয়ার্ত মানুষ আত্মগোপন করে। জীবনের ভয়-ডর ভুলে অনেকের আত্মীয়স্বজন লাশ দাফনের জন্য এগিয়ে আসলেও পাওয়া যায়নি কাফনের কাপড়। এমনিভাবে সিদ্দিকুর রহমানের লাশ দাফন করেছিল সাদা চাদর মুড়িয়ে। এই বীর শহিদ ফায়ার ফাইটার সিদ্দিকুর রহমান চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন শালুকপাড়া গ্রামে।

শহিদজায়া রওশন আরা তার স্বামী শহিদ সিদ্দিকুর রহমানের স্মৃতি নবজাতক কন্যা মুক্তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন আজীবন। মুক্তার মুখচ্ছবিতে শহিদ স্বামীর স্মৃতি খুঁজে বেদনা ভুলে থাকতে চেয়েছেন শহিদজায়া। ছোট্ট মেয়ে মুক্তাকে বুকে নিয়ে শুনিয়েছেন তার স্বামীর শহিদ হওয়ার বেদনার কাহিনি। মুক্তা তার বাবার বুকের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার গল্প শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছে। মায়ের কাছে শুনেছে বাবার হাতে গড়া একটি বাঁশের সাঁকোর গল্প। রওশন আরা মেয়ের কাছেই রেখে গেছেন তার শহিদ স্বামীর একাত্তরের গল্পগাথা। এক সময় তার জীবনের গল্প শেষ হয়ে যায়। তখন রওশন আরা বেগম জীবনের লেনদেন মিটিয়ে একমাত্র কন্যা মুক্তাকে রেখে চলে গেলেন অনন্ত ঘুমের দেশে। যে দেশ থেকে কেউ আর ফিরে আসে না কোনোদিন। শহিদ স্বামীর রক্তঝরা গল্প রেখে গেলেন একমাত্র কন্যা মুক্তার কাছে।

চন্দ্রকলার মতো দিনে দিনে বেড়ে ওঠে মুক্তা। জীবনের প্রয়োজনে গড়ে তোলে সংসার। মুক্তার ঘরে আসে সন্তান-সন্ততি। মুক্তা এখন তার ছেলেমেয়েদের বাবার গল্প শোনায়। স্বাধীনতার গল্প। লাল-সবুজ পতাকায় ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে মুক্তার শহিদ বাবা সিদ্দিকুর রহমানের বুকের তাজা রক্ত। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম শুনে যাচ্ছে একজন শহিদ ফায়ার ফাইটারের গল্প। একটি বাঁশের সাঁকোর গল্প।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফের জন্য দুজন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান মনোনীত

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন প্রদানের জন্য দুজন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে।

ব্যক্তি ক্যাটাগরিতে মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন– অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বন সংরক্ষক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), বাংলাদেশের সাবেক কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশতিয়াক উদ্দিন আহমদ এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান।

প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন– বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের আশুরহাট পাখি সংরক্ষণ সমিতি। ১৮ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন-২০২০ প্রদানের লক্ষ্যে মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২ ভরি (২৩ দশমিক ৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০ হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট পে-ই চেক এবং সনদপত্র দেওয়া হবে। আগামী জুন মাসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য বৃক্ষমেলার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাচিতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: সীমান্ত হোসেন

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক নেতৃত্ব

জান্নাতুল ফেরদৌস আইভী

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে বাংলাদেশকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশের সুদৃঢ় পররাষ্ট্রনীতি নির্মাণে এবং কূটনৈতিক স্বীকৃতি অর্জনে বঙ্গবন্ধুর সুনিপুণ নেতৃত্বকে জানা আবশ্যক।

হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবির সমর্থনে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করার ফলে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধু মুক্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের সমান্তরাল পথে এগিয়ে গিয়ে বিশ্বে মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তোলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু সংবিধান রচনার মাধ্যমে নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করেন এবং একইসঙ্গে এর পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে করণীয় ও দিক নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ অর্ধশত বছর ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করছে বঙ্গবন্ধুর গ্রহণ করা সেই পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই। যে মূল বিষয়গুলোর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু একটি উদার ও সুদূরপ্রসারী পররাষ্ট্রনীতি গড়েছিলেন, সেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলমন্ত্র হিসেবে সংবিধান রচনা করেন ১৯৭২ সালে। এই সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে বাংলাদেশ। এই সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণনা রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয় ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে। কাজেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার। বাংলাদেশের সংবিধানের মূল হস্তলিখিত রূপের পাতা ৮-এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় যে নীতিমালা লেখা আছে তা হলো:

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা– এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে একাধারে দেশ গঠন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন দুই-ই রক্ষা করেন কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতিমালার মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বাংলাদেশ যে পরিচয় অর্জন করেছে তা বঙ্গবন্ধুর সরকারের রচিত নীতিমালা এবং প্রদর্শিত কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় অর্জিত ফসল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সরকার বাংলাদেশকে যে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিল, ক) বাঙালি শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান খ) মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং কূটনৈতিক জনমত গঠনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে ভারত সরকার এবং গ) মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করতে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতীয় সৈন্যের অংশগ্রহণ।

এ কারণে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিষয় ৩টিকে সবার আগে গুরুত্ব দেন বঙ্গবন্ধু– ক) বাংলাদেশ থেকে ১৯৭২ সালের ১ থেকে ১৫ই মার্চের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যাহার করা খ) মার্চ ১৯৭২ সালের '২৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষর করা এবং গ) ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমানা চুক্তি স্বাক্ষর করা।

জোটনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে বঙ্গবন্ধুর আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব

ফিলিস্তিনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেকটা জন্মের পর থেকেই। অত্যাচারী পাকিস্তানের শাসকদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে গোটা মুসলিম বিশ্ব সহজভাবে নেয়নি এবং আরবরা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেও অনীহা

প্রকাশ করে। স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা এবং তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই অচলাবস্থা কাটানোর উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে 'ওআইসি'সহ আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেন তিনি।

বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু এই সময়ে ন্যাম সম্মেলন এবং ওআইসি সম্মেলনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সফরের মাধ্যমে তিনি বিশ্বনেতাদের কাছে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার ফলেই আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায় বাংলাদেশের বিষয়ে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মিশর-সিরিয়া-ফিলিস্তিন জোটের প্রতি প্রকাশ্যে জোরালো সমর্থন ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসময় যুদ্ধে সেবা

মস্কোতে ৩রা মার্চ ১৯৭২ সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি মেডিকেল টিম এবং ত্রাণসামগ্রীও পাঠান। এর কিছু পরেই ঐ ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় বাংলাদেশ।

বিশ্বনেতৃবৃন্দের অথবা তাঁদের প্রতিনিধিবৃন্দের বাংলাদেশ সফরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ গ্রহণের নজির ছিল বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক জনপ্রিয়তার একটি অংশ। ১৯৭৪ সালে আরব রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানকে চাপ দিতে থাকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য। পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে দ্বিতীয় ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেই সম্মেলনে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন তিনি। এরই মধ্যে বাংলাদেশের দরজা উন্মুক্ত করা হয় ফিলিস্তিনের জন্য এবং পিএলও-কে সরকার ঢাকায় আমন্ত্রণ জানায় অফিস খোলার জন্য। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকায় পিএলও নেতারা এবং কূটনীতিকরা আসেন এবং ফিলিস্তিনের প্রথম কোনো দপ্তর খোলা হয় ঢাকায়। বাংলাদেশ অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো প্রথম থেকেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। ১৯৭৪ সালের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সভায় আলজেরিয়ায় কিউবার মহান নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে বৈঠক হয় বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, তাঁর সিদ্ধান্ত, অবিচলতা নিয়ে বলতে গিয়ে ক্যাস্ট্রো বলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো'। বঙ্গবন্ধুকে প্রথমবার দেখে ক্যাস্ট্রো এই উক্তি করেছিলেন।

বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান

১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ৮ দিন পর ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রথম ভাষণ দেন। সেদিন সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেন ইংরেজিতে বক্তৃতা করার জন্য। বঙ্গবন্ধু বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, 'মাননীয় সভাপতি আমি আমার মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই'। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছয়টি, তারমধ্যে বাংলা ভাষা না থাকায় বঙ্গবন্ধুর অনুরোধেই অধিবেশনের সভাপতি বাংলায় বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন সেদিন।

সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের গঠন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন দুটি দিক রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতিমালার মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের সকল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। এত সংক্ষিপ্ত অথচ এত শক্তিশালী বলেই পররাষ্ট্রনীতির দূরদর্শিতার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও বেঁচে আছেন বাংলাদেশের সব প্রজন্মের নাগরিকের আন্তর্জাতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, মানবাধিকার কর্মী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

পল্লিবাংলার রূপকার কবি জসীমউদ্‌দীন

দেলওয়ার বিন রশিদ

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা অতি সহজভাবে ফুটিয়ে তুলে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন কবি জসীমউদ্‌দীন। বাংলার সবুজ ঐশ্বর্যের মতোই বাংলা সাহিত্যে জসীমউদ্‌দীন দেদীপ্যমান। তাঁর কাব্যের উপকরণ তিনি লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। গাঁয়ের সাধারণ রাখাল ছেলে, পল্লিবালা, চাষির বউ, জেলে-মাঝি, বেদে-বেদেনির সহজ-সরল জীবনালেখ্য তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। তিনিই সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় পল্লির মাঠ-ঘাট, শস্যক্ষেত, নদীনালা, বালুচর, খালবিল আর পল্লির সবুজের বিস্তৃত রূপ সুষমা। তাঁর কাব্যে উজ্জ্বলতা পেয়েছে গাঁয়ের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ ও নিসর্গ প্রকৃতি।

পল্লি প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠা পল্লির মানুষের স্নেহ-প্রীতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, দুঃখ-বেদনা অতি মমতায় অবলোকন করে জসীমউদ্‌দীন নিজস্ব ভাষাশৈলীতে বাংলা সাহিত্যে তা দীপ্তমান করেন। পল্লির মানুষের জীবনালেখ্য বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'পল্লিকবি' বলা হয়।

তিনি গ্রামে বড়ো হয়েছেন, গ্রামের মানুষদের ভালোবাসতেন, গ্রামের মানুষের জীবনযাপন তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত, গ্রামের মানুষের কথা বলা, চাল-চলন সরলতা তাঁকে কাছে টানত, সবসময়ই গ্রামের ভালোবাসায় তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন, যে কারণে তাঁর লেখায় পল্লির প্রতিচ্ছবি সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তিনি ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুর শহর সংলগ্ন তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়িও ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে গোবিন্দপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম মৌলভী আনসার উদ্দীন, মাতার নাম আমেনা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। কম বয়সেই পিতা আনসার উদ্দীনের কাছে জসীমউদ্‌দীনের লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় বাড়ির কাছেই শোভারামপুর অম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালায়। এখানে কিছুকাল পড়ালেখা করার পরে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় ফরিদপুর জেলা শহরে অবস্থিত 'হিতৈষী' মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। এখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পর তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় ফরিদপুর জেলা স্কুলে।

এ সময় জসীমউদ্‌দীনের পাঠ্যপুস্তকের কবিতা পড়ে তাঁরও কবিতা লেখার ইচ্ছে হয়। গ্রামের রহিম মোল্লা কবিগান রচনা করে জানতে পেরে তার কাছে ছুটে গেলেন, কবিতা লেখার বিষয়ে তার সাথে কথা হয়, একদিন দুজনে গান রচনা পাল্লা দিতে আগ্রহী হলেন। সত্যি একদিন দুজনের গান রচনার পাল্লা হয়। রহিম মোল্লা জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি জসীমউদ্‌দীনকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিলেন। জসীম উদ্‌দীন কবিতা লেখার চর্চা করতে থাকেন। ক্রমেই তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর ইশান স্কুলের ক্ষিরোদ বাবু নামে একজন শিক্ষক কবিতা লিখতেন, সেই সঙ্গে কবিতার গুণগ্রাহীও ছিলেন। ক্ষিরোদ বাবু একদিন জসীমউদ্‌দীনের কবিতা শুনলেন। তাঁর কবিত্ব প্রতিভায় তিনি অভিভূত হলেন, তাঁকে কাছে টেনে আদর করলেন। কবিতার বই পড়তে উপদেশ দিলেন। জসীমউদ্‌দীন কবিতা লেখায় চর্চা করতে থাকেন।

১৯২১ সালে তিনি জেলা স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। একই কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে তিনি বি.এ পাস করেন। বি.এ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩১ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ পাস করেন।

জসীমউদ্‌দীন যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন তাঁর বিখ্যাত কবিতা *কবর* রচনা করেন। যা ১৯২৬ সালে *কল্লোল* পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশের পর পরই তিনি সব মহলে একজন প্রতিভাদীপ্ত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সব কবিতার মধ্যে 'কবর' কবিতাটি শ্রেষ্ঠ। এ কবিতা পড়ে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কবিকে লেখেন, 'দূরাগত রাখালের বংশীর ধ্বনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।'

কবি যখন বি.এ ক্লাসের ছাত্র তখন এ 'কবর' কবিতাটি মেট্রিক ক্লাসে পাঠ্যভুক্ত করা হয়। ছাত্রাবস্থায় জসীমউদ্‌দীন গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকমুখে প্রচলিত ছড়া, শ্লোক, গীত সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁকে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন উৎসাহিত করেন। গ্রাম্য লোকগাঁথা, গীত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিক সত্তর টাকা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন। জসীমউদ্‌দীন ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিটেন্ট হিসেবে নিযুক্তি পান এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৩৮ সালে জসীমউদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মাদারীপুরের মহসীন উদ্দীন খানের কন্যা মমতাজ বেগম মনিমালার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি

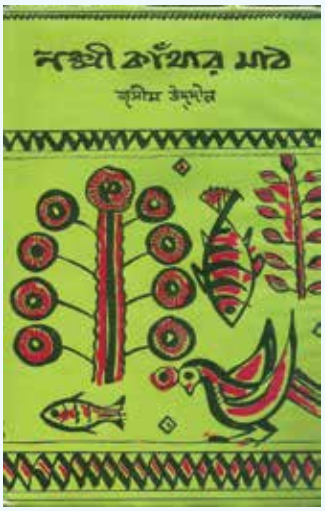

বিভাগে চাকরি নেন এবং ঢাকা ছেড়ে নতুন কর্মস্থল কলকাতায় গমন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে এই পদে বহাল হন। ১৯৬১ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি একজন মানবদরদি, উদার সাহিত্যসাধক, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন ছবি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষ তাঁর সাহিত্যে পেয়েছে অতি দরদের সঙ্গে স্থান।

তাঁর কাব্য হৃদয় ছোঁয়া, তেমনি অত্যন্ত সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর। তাঁর স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীর ভাষা ও বর্ণনা অনন্য। তাঁর লেখা গান, লোকনাট্য, ভ্রমণ কাহিনি ও শিশুসাহিত্য শৈল্পিক নৈপুণ্যে অসাধারণ ও অনন্য।

তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ *রাখালি* (১৯২৭) ও *নকশিকাঁথার মাঠ* পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মন্তব্য করেন, 'জসীমউদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজ ভাষায় লেখার যাদের শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।'

জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক ও সম্পাদক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন, 'আমি হিন্দু, বেদ আমার নিকট পবিত্র। কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের কবিতা বেদের চাইতেও আমার নিকট পবিত্র। কারণ, জসীমউদ্‌দীন আমার স্বর্গাদপী গরিয়সী পল্লিগ্রামের কথা তাঁর কাব্যে লিখেছেন।'

তাঁর অনন্য অসাধারণ সৃষ্টিসম্ভার যেমন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, তেমনি পাঠক হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে: *রাখালি* (কবিতা- ১৯৩০), *ধান ক্ষেত* (কবিতা- ১৯৩১), *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (কাহিনী কাব্য- ১৯৩৩), *রঙিলা নায়ের মাঝি* (গানের সংকলন- ১৯৩৫), *হাসু* (কিশোর কবিতা- ১৯৩৮), *রূপবতী* (কবিতা- ১৯৫১), *বেদের মেয়ে* (লোকনাট্য- ১৯৫১), *মধুমালা* (লোকনাট্য- ১৯৫১), *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* (১ম খণ্ড, শিশুসাহিত্য- ১৯৬০), *ডালিম কুমার* (শিশু সাহিত্য- ১৯৬০), *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* (স্মৃতিকথা- ১৯৬১), *সুচয়নী* (কবিতা- ১৯৬১), *গল্প স্বল্প* (শিশুসাহিত্য- ১৯৬২), *মা যে জননী কান্দে* (কাহিনীকাব্য- ১৯৬৩), *জীবন কথা* (স্মৃতিকথা- ১৯৬৪), *বোবা কাহিনী* (উপন্যাস- ১৯৬৪), *বাঙ্গালীর হাসির গল্প* (২য় খণ্ড, শিশুসাহিত্য-১৯৬৪), *কত গল্প কত কথা* (শিশু সাহিত্য- ১৯৬৭), *জলের লেখন* (কবিতা- ১৯৬৯), *ভয়াবহ সেইদিনগুলিতে* (কবিতা- ১৯৭২), *বউটু বানীর দুল* (উপন্যাস- ১৯৯০), *যমুনাবতী* (কিশোর কবিতা- ২০০১) ইত্যাদি।

শিশু-কিশোরদের জন্য জসীমউদ্‌দীন প্রচুর লিখেছেন। তাঁর লেখায় শিশু-কিশোরদের মনের খোরাক সবচেয়ে বেশি ছিল। তাঁর প্রতিটি লেখায় ছিল আন্তরিক মমতার স্পর্শ। দরদ দিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় লিখেছেন হৃদয় ছোঁয়া ছড়া. কবিতা, হাসির গল্প। ১৯৩৮ সালে শিশু-কিশোরদের ছড়া-কবিতার বই *হাসু* কলকাতার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। *হাসু*'র প্রতিটি ছড়া-কবিতায় শিশু-কিশোরদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়–

আমার বাড়ি যাইও ভোমর
বসতে দেব পিড়ে
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিড়ে।
আমার বাড়ি যাইও ভোমর
এই বরাবর পথ
মৌরী ফুলের গন্ধ শুকে
থামিও তব রথ।

হাসু গ্রন্থের অন্য একটি কবিতা 'মামার বাড়ি'– যা খুবই পরিচিত ও প্রিয় কবিতা। এর জনপ্রিয় দুটি লাইন–

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।

তাঁর এমন সহজবোধ্য অনেক ছড়া-কবিতা শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এক পয়সার বাঁশি'। এতে নিঃস্ব, রিক্ত অসহায় হতদরিদ্র শিশু-কিশোরদের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর শিশুতোষ প্রতিটি গ্রন্থই অনন্য অসাধারণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় অতি নিষ্ঠায় উঠে এসেছে। তাঁর 'ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে' গ্রন্থের মুক্তিযুদ্ধের কবিতাগুলো খুবই হৃদয়ছোঁয়া।

কবি জসীমউদ্‌দীন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৭০ লাইনের দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় লিখেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

মুজিবুর রহমান
এই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিউগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বালিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে;
বিগত দিনের যত অন্যায়, অবিচার ভরা যার;
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান দিল প্রকাশের মুখে,
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি...
(বঙ্গবন্ধু, রচনা- ১৯৭১)

কবিতাটি হৃদয়স্পর্শী ও পাঠকপ্রিয়। বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন আশা ও সংগ্রামের সমন্বয়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা জসীমউদদীনের এ কবিতাটির ভাষা, বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও অসাধারণ।

পল্লির মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ, দুঃখ ও বিরহবেদনা আর গ্রামবাংলার সৌন্দর্য সুষমার অনন্য রূপকার জসীমউদ্‌দীন ১৯৭৬ সালে ১৪ই মার্চ পরলোকগমন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, কবি ও প্রাবন্ধিক

প্রজন্ম হোক সমতার: সকল নারীর অধিকার

সেলিনা আক্তার

মানবসভ্যতা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। আর সেইসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগোচ্ছে মানুষ। নারীপুরুষের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নানা পেশায় অংশ নিচ্ছে, নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, অংশ নিচ্ছে পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারেও। সভ্যতার শুরুতে নারী ও পুরুষ ছিল একে অপরের পরিপূরক। কালক্রমে নারী ও পুরুষের এই সমতাভিত্তিক সমাজের অবসান ঘটে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতা বিনষ্ট হয় এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে থাকে। তার নিজস্ব সত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা– সর্বত্র শুরু হয় নারীর সংগ্রাম। এক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, লিঙ্গসমতার প্রতি প্রবল অনীহা, মানবতার প্রতি উদাসীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় নারীর মর্যাদা, শ্রমের মূল্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুগে যুগে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে চার দেয়ালে আবদ্ধ রেখে নারীর মেধা, প্রতিভা আর কর্মস্পৃহা অবদমন করা হয়েছে বার বার।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের পুনর্বাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন' ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের নয় মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। যে সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না' এবং ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন'। সরকার গঠনের শুরু থেকেই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জাতির পিতার নির্দেশনা ছিল। দেশে রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সরকারই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য দশভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ আসনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রাখা হয়। এর পাশাপাশি উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি চাকরি ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সংবিধানে শুধু নারী-পুরুষের সমতাই নিশ্চিত করা হয়নি বরং সরকারি চাকরিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসম প্রতিযোগিতা ও প্রতিনিধিত্বের অবসান করা হয়। সরকারি চাকরিতে মেয়েদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সবক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ আবাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ডের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে নারীর অগ্রযাত্রা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার দর্শন অনুসরণ করে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষাসহ সকল ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুরক্ষা ও নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারের আলোকে নারী দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য। নারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার মোট বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে ৭৬ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি মানুষ বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ২০২০ সালে দশ নারীকে জয়িতা পুরস্কার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আবার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা ও জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী যা বিশ্বে বিরল। এদেশের নারীরা আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও পুলিশবাহিনীতে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করছে। মাঠ প্রশাসনে নারী ওসি, ইউএনও, এসপি ও ডিসি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। বিদেশের মাটিতে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর নারী সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন

করছে– যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে আছে নারীরা। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ও অনলাইন ব্যবসায় বাংলাদেশের নারীরা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করেছে। এছাড়া নারীরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক ও কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এক কোটি চল্লিশ লাখ ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা বিভিন্ন শিরোপা অর্জনে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান ৮ই মার্চ ২০২১ ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে মুজিব জন্মশতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন চলচ্চিত্র উৎসব সমাপনী ও নারী সম্মাননা-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পদক বিতরণ করেন–পিআইডি

নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'মাল্টিসেক্টোরাল প্রোগ্রাম' দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগে 'জয় মোবাইল অ্যাপস' নামে একটি মোবাইল অ্যাপস প্রবর্তন করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার কিংবা নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে এমন নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করার জন্য এই অ্যাপস ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও ১০৯ নম্বরে ফোন করে নারী ও শিশুসহ সকল শ্রেণির মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন। মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯-এ নারীদের ওপর যৌন হয়রানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানজনক 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন। যেসব নারী তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি সেসব নারীদেরকে এই অ্যাওয়ার্ড উৎসর্গ করেছেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে 'ডব্লিউআইপি গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন ৮ই মার্চ পালিত হয় বিশ্বজুড়ে। ১৮৫৭ সালে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা এবং কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। কিন্তু শৃঙ্খলিত সমাজ সেদিন তা মানতে পারেনি। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান রাজনীতিবিদ সে দেশের সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেটকিন প্রতিবছর ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ সাল থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে এবং দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এবং দিবসটির তাৎপর্য অনুধাবন করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা, বাল্যবিয়ে ও যৌতুক প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সংশোধন করে ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রতিস্থাপন করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৪১ সালে বাল্যবিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে ২০১৪ সালে লন্ডন গার্লস সামিটে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সেলক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ও বাল্যবিয়ে নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০-এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকার গত দশ বছরে যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, শিশু আইন ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাংলাদেশ অর্জন করেছে বিশ্বের অন্যতম স্থান। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, স্পিকার, মন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সামরিকবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাবসহ সব জায়গায় নারীর সরব উপস্থিতি। তাদের গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বাধাহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অনেক অর্জনের মধ্যে ছোটোখাটো যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করে নারীর অধিকার নিশ্চিতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকলে নারী দিবসের চেতনা সার্থক হবে এবং বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে এবং নারীর অধিকার আদায় সম্পূর্ণ হবে। সফল হোক এ বছরের নারী দিবস, এটাই সকলের প্রত্যাশা।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও তথ্য সহকারী, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা

অগ্নিম বিশ্বাস সূর্য

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বেতারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য ও অনস্বীকার্য। এদেশের ইতিহাসের সকল সংকটকালে দেশের বৃহত্তম গণমাধ্যম হিসেবে বেতার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া রেডিও'র 'ঢাকা কেন্দ্র' হিসেবে ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে একটি বাড়িতে পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বেতারের কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে 'রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা' নামে বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বেতারের শিল্পীকলাকুশলীরা সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয়দফা, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-র মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালনের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বেতার কেন্দ্রের।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। সেসময় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভাষণটি বেতারে প্রচারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃসাহসী কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি সম্প্রচার করে। এরপর ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের উপর নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যে ঘোষণা ছিল যে-কোনো মূল্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান। সেই সংকটকালে স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত বেতার কর্মীরা একজোট হন। কারণ তখন একমাত্র বেতার-ই ছিল, যার মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা। এলক্ষ্যে বেশ কয়েকজন বেতার কর্মকর্তা স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। এই বেতার কেন্দ্রই সেদিন বাঙালি জাতিকে যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। পরবর্তী দুইদিন পর এ বেতার কেন্দ্রের নাম থেকে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে নতুন নাম রাখা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা সম্প্রচারের মাধ্যমেই প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের। এ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত যুদ্ধসংবাদ, সংগীত ও কবিতা, নাটক, কথিকা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল বিভাগের কর্মীসহ শব্দসৈনিকরা মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার কাজ করেছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারে প্রচারের পরপরই পাকিস্তান বিমানবাহিনী ৩০শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। ফলে এটি অচল হয়ে যায়। তাই কেন্দ্রটি ৩রা এপ্রিল ১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় স্থানান্তরিত করে একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে এর দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে দশজনের একটি সম্প্রচার দল নিয়ে এই বেতার কেন্দ্র শালবাগান ও বাগাফা হয়ে বেলুনিয়া ফরেস্ট হিলস রোডে স্থানান্তরিত হয়। নতুন পর্যায়ে বেতার কেন্দ্রটির সংগঠনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন স্ক্রিপ্ট-লেখক ও গায়ক বেলাল মোহাম্মদ। দলের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার সদস্য আবদুস শাকের কালুরঘাট থেকে নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সমিটারটিকে কার্যক্ষম করে তোলেন। ২৫শে মে কেন্দ্রটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। ২৬মে ঢাকা থেকে আসা রেডিও-র কর্মীদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রূপে এর কার্যক্রম শুরু করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো– সেই সময়ে রচিত কিছু অসাধারণ জনপ্রিয় গানের সম্প্রচার। যুদ্ধ চলাকালীন প্রচারিত দেশাত্মবোধক গানগুলো গণমানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা', 'সালাম সালাম হাজার সালাম', 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে', 'নোঙর তোলো তোলো' গানগুলো শিল্পীদের কণ্ঠে যুদ্ধমন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান ছিল 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার'। এই ব্যতিক্রমধর্মী দুটি অনুষ্ঠান বাংলার জনগণের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং জাতীয়তা বোধের প্রকাশ ঘটায়।

স্বাধীনতা-উত্তর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ বেতার'। বিশ্বব্যাপী বেতারের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে ২০১১ সালে ইউনেস্কোর ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলনে বিশ্ব বেতার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস পালনের অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকেই বাংলাদেশ বিশ্ব বেতার দিবস পালন করে আসছে। বর্তমানে দিবসটি উদযাপনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে একটি অনুসরণীয় মডেল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

সংগ্রামী নেতা নূরলদীনের প্রেম

হেলাল হোসেন কবির

কৃষকদের বর্তমান অবস্থায় আসার পেছনে রয়েছে বহু ইতিহাস। বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলের কৃষকদের চড়ামূল্য দিতে হয়েছে খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকে। সেই সময় চারদিকে ছিল কৃষককের ছোটাছুটি। অসহায় কৃষকরা সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। জমিদারের চাপিয়ে দেওয়া খাজনার ভয়ে সবাই ভীত। পরিবার-পরিজন নিয়ে কষ্ট আর অত্যাচার সহ্য করে বসবাসের পরিবেশ ছিল না। খুব পাশবিক নির্যাতন নেমে আসত কৃষকদের ওপর। জমিতে যা ফলাতো তার সবটুকু খাজনা দিতেই শেষ হয়ে যেত। ফলে কৃষকরা থাকত অভাবে। তাদের সচেতন করতে এসেছিল একজন দেবদূত। বাংলার মাটি উর্বর হলেও মনের ভেতর ছিল দারুণ খড়া। আর সেই খড়াকে জাগিয়ে তুলতে নূরলদীনের জন্ম হয় এই মাটিতে।

১৭৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। সে সময় আরো বেশি করে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার প্রজা ও কৃষকরা ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। ইংরেজরা কুখ্যাত ও অত্যাচারী দেবীসিংহকে এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার নিয়োগ করেন। চতুর দেবীসিংহ অধিক অর্থ বা রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ডিমলা জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা হরেরাম সেনকে তার সহকারী নিয়োগ করে প্রজা ও কৃষকদের নিপীড়ন শুরু করেন।

ধারণা করা হয় ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে নবাব বাকের মোহাম্মদ নূরলদীন জঙ্গ বা নূরলদীনের মাঝে প্রতিবাদী চেতনা আসে। তিনি কৃষককের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। ইংরেজরা একটু ঘাবরাতে থাকে। কেননা তাদের কাজের প্রতিবাদ করার মতো ইতঃপূর্বে কেউ ছিল না। তাকে প্রতিহত করার জন্য সেই সময়ের রাজারা উত্তর জনপদে বেশি বেশি করে জমিদার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সময় গড়াতে থাকে নূরলদীন আস্তে আস্তে ভিত গড়তে শুরু করেন।

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) এ অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এ সময় আনুমানিক এক কোটি লোক মারা যায়। লোক কমে যাওয়ার কারণে এই এলাকার জমিদারগণের আয়ও কমে গিয়েছিল। ১৭৭২ সালে পাঁচসনী বন্দোবস্তরে সময় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট সকল জমিদারকেই বেশি টাকা জমা দিয়ে জমি নিতে হয়েছিল। কোম্পানির রোকারিতে খাজনা বৃদ্ধি করা নিষেধ থাকার পরও দেবীসিংহ এই অঞ্চলের সকল জমিদারকে তলব করেন। সকল জমিদারই অতিরিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন হরেরাম সেন তাদেরকে চাবুক মারার আদেশ দেন এবং গরুর গাড়িতে চড়ে ঢাক-ঢোল পিঠিয়ে জাতিচ্যুত করার পরিস্থিতি তৈরি করেন।

এরপর সাধারণ কৃষকদের ওপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। কৃষকগণ এসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দলে দলে গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। অপরদিকে কৃষকরা যাতে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে না পারে সেজন্যও হরেরাম সেন গ্রামে গ্রামে পাহারা বসায়। আবার পাহারাদারদের বেতন দেওয়ার জন্য কৃষকদের ওপর 'চৌকিবন্দি' নামে নতুন কর বসানো হয়। এভাবে দেবীসিংহ কৃষকদের ওপর একুশ প্রকারের কর আরোপ করে।

কৃষকদের কাছে খাজনা আদায়ের এক পর্যায়ে স্বাধীনচেতা যুবক নূরলদীন দেবীসিংকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং তার লোকজনকে প্রহার করে ফেরত পাঠায়। এ ঘটনার পরপরই অন্যান্য কৃষক ও প্রজারা নূরলদীনের কাছে পরামর্শ চায়। নূরলদীন ও তার সঙ্গী বয়স্ক জোতদার দয়াল চন্দ্র শীল কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। ইংরেজ বাহিনীর অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নূরলদীন ও দয়াল শীল কৃষকদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

জানা যায়, পরলোকগত একজন বড়ো জোতদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা লালমনি কৃষকদের ওপর এ অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হন। তিনি নূরলদীনকে গোপনে তার বাড়িতে ডেকে আনেন এবং এ কৃষক আন্দোলনে অর্থ-কড়িসহ সকল বিষয়ে সহায়তা দিতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে লালমনি নূরলদীনের ঘনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হতে থাকেন। লালমনিকে পাশে পেয়ে নূরলদীন সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে আর কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্নভাবে স্লোগানে মুখরিত করতে থাকে। তার সেই জাগরণের ডাক 'আইসো বাহে কোনটে সবায়' আজও সকলের কানে বাজে। নূরলদীনের তখন আন্দোলন ছাড়া আর অন্য কিছু চিন্তা করার সময় থাকে না কিন্তু লালমনি আন্দোলনের পাশাপাশি নূরলদীনকে গভীরভাবে ভালোবাসতে থাকে। তাদের মধ্যে এক অন্যরকম ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। বিশ্বাস স্থাপনের ভিত বাড়তে থাকে।

এরইমধ্যে ইটাকুমারীর রাজা শিবচন্দ্র দেবীসিংহের রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলে দেবীসিংহ ও হরেরাম সেনের লাঠিয়াল বাহিনী শিবচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে রঙ্গপুরের মীরগঞ্জে দেবীসিংহের কুঠিবাড়ির অন্ধকার ঘরে আটকিয়ে রাখে এবং শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে। শিবচন্দ্রের স্ত্রী অন্যান্য জমিদারদের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাবিত্রীব্রত পালন করেন। জমিদারনী দেবী চৌধুরানী ও সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেতা ভবানী পাঠকের সহায়তায় অনেক টাকা রাজস্ব দিয়ে রাজা শিবচন্দ্রকে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা করেন। রাজা শিবচন্দ্র মুক্ত হওয়ার পর ইটাকুমারীতে দেবীসিংহ ও ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমমনা জমিদারগণ– দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, নূরলদীন, লালমনি ও দয়াল শীলসহ অনেকের সঙ্গে বৈঠক হয় এবং সে বৈঠক থেকেই প্রজা ও কৃষক বিদ্রোহের সূচনা

হয়। সমমনা জমিদারগণ নূরলদীনকে তার আন্দোলনে সব রকমের সহায়তাদানের আশ্বাস দেন। তারপর দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে বিদ্রোহী কৃষকরা নূরলদীনের দলে আসতে শুরু করে। তখন দেবীসিংহ বুঝতে পারেন দূরের কৃষকরা গরুর গাড়িতে এসে নূরলদীনের সঙ্গে জমায়েত হয়। তাই কৃষকদের কাছে নতুন করে খাজনা হিসেবে গরুর খাবারের তুষ নিতে শুরু করেন। সেই তুষ তুলে ভাণ্ডারখানায় রাখা হতো। বর্তমান কালিগঞ্জের তুষভাণ্ডার ছিল সেই সময়ের ভাণ্ডারখানা।

টেপা পরগনার রামমোহন রায় চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী জয়মনি দেবী তার নাবালক পুত্র আনন্দ মোহনের পক্ষে জমিদারি চালাতে থাকে। নূরলদীনের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি প্রজাদের দুরবস্থা দেখে খাজনা তোলা বন্ধ রাখেন। তার জন্য জয়মনি দেবীকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার দেবীসিংহ মহিলা লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে জমিদার বাড়ির ভেতরে গিয়ে মহিলাদের সোনার গয়নাসহ সকল মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং মহিলাদেরকে লাঞ্ছিত করে। এরপর দেবীসিংহ টেপা পরগনায় রাজস্ব আদায়ের জন্য গোকুল মেহেতাকে নিয়োগ দেন। গোকুল মেহেতা সেখানকার কৃষকদের ওপর খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার শুরু করলে নূরলদীন তার বাহিনী নিয়ে টেপা পরগনা আক্রমণ করে এবং গোকুল মেহেতাকে মেরে ফেলে।

নীল চাষিদের জুলুম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে ডিমলায় নূরলদীনের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে নূরলদীন অত্যাচারী ও রাজস্ব আদায়কারী গৌরমোহন চৌধুরীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং এই পরগনার অন্যান্য রাজস্ব কাচারিসমূহ লুট করে আগুন জ্বেলে দেয়। এভাবে নূরলদীন বাহিনী সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে কৃষককের শত্রুদের হত্যা শুরু করে। ইংরেজ বাহিনী সমঝোতার প্রস্তাব দিলে বিদ্রোহীরা ইজারাদারদের বিরুদ্ধে এক স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু ইংরেজদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে কৃষকরা আবার সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

চাকরিচ্যুত সিপাহীদল, কোচবিহারের বিদ্রোহী পলাতক প্রজা এবং রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বিদ্রোহী প্রজার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ধারণা করা হয় এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ। তারা বর্তমান লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে অবস্থান করছিল। ইংরেজ সমর্থিত জমিদাররা তখন প্রাণের ভয়ে আত্মগোপন করে। অবস্থা বেগতিক দেখে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই রংপুরের কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাডকে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডকে রংপুরে পোস্টিং দেন। সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ড অতি ক্ষিপ্রগতিতে লালমনিরহাটের মোগলহাটের দিকে অগ্রসর হন। নূরলদীনের দল তখন দুভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমদলে বীর নূরলদীন, লালমনি ও তার দেওয়ান দয়াল শীলের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক প্রজা পাটগ্রাম থেকে সাহায্যকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু ইতঃপূর্বে গুপ্তচর রমাকান্ত মুন্সি জমিদারির লোভ দেখিয়ে অলকা ও পবিত্রা নামের দুজন স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসীদল থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এই দুই মহিলা নূরলদীনের সঙ্গে ছিল। তারাই প্রতারণার জাল বিস্তার করে নূরলদীন বাহিনীকে মোগলহাটে গোপনে অবস্থিত সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে নিয়ে যায়। অপরদিকে নূরলদীনের সঙ্গে কতজন সৈন্য আছে সেটা আন্দাজ করতে না পেরে ইংরেজ বাহিনী তার সৈন্যদের কৃষকদের পোশাক পরিয়ে নূরলদীন বাহিনীর পিছনে পাঠিয়ে দেয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নূরলদীন, লালমনি ও দয়ালশীলসহ তার বাহিনী সামনাসামনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু একজন ইংরেজ সৈন্য পিছন দিক থেকে এসে নূরলদীনকে অতর্কিত হামলা চালায়। নূরলদীন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। লালমনি তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। দয়ালশীল বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন।

লালমনি আহত নূরলদীনকে তিস্তা নদী তীরবর্তী এলাকায় নিয়ে গিয়ে সেবা করতে থাকে। নূরলদীনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধের সৃষ্টি হয়। লালমনি তার প্রেমের মর্যাদা দিতে থাকে। তখনো ইংরেজ বাহিনী হন্যে হয়ে নূরলদীনকে খুঁজতে থাকে। উপায় না দেখে লালমনি গভীর রাতে তিস্তা নদী পার হয়ে মিঠাপুকুরের কাছে ফুলচৌকি নামক জায়গায় নূরলদীনের এক আস্তানায় নিয়ে আসে। নূরলদীনের শরীরের অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হতে থাকে। আন্দোলন সংগ্রামে বিরামহীন আর বিশ্রামহীন নূরলদীন বুঝতে পারে যে লালমনি তাকে কী পরিমাণ ভালবাসতো। জীবনের শেষ সময় নূরলদীন লালমনির ভালোবাসা বুঝতে পারে। লালমনির জন্য আর এদেশের হতভাগা কৃষকদের জন্য তার বেঁচে থাকার আকুতি যখন প্রবল হতে থাকে তখনই নূরলদীনের মৃত্যু হয়। হতভাগ্য লালমনি নূরলদীনের শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। নূরলদীনের মৃত্যুর পর লালমনি প্রতিশোধের জন্য কৃষকদের জমায়েত করতে তিস্তা নদী পার হয়ে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির উদ্দেশে মোগলহাটের কাছাকাছি আসেন তখন ইংরেজ গুপ্তচরসহ সৈন্যদের কবলে পড়েন। তখন লালমনির সঙ্গে তেমন লোকজন ছিল না তাই নূরলদীনের ভালোবাসার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ও ইংরেজদের হাতে ধরা পরা এড়াতে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তাদের প্রেম পবিত্রময় করে রাখতে লালমনির এই পদক্ষেপ।

ইতিহাসখ্যাত কৃষক প্রজা বিদ্রোহের সবচেয়ে উত্তপ্তময় সময় ছিল ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৮৩ সালের প্রথম দিকে কৃষক আন্দোলনের এই মহান নেতা নূরলদীন মৃত্যুবরণ করেন। রংপুর অঞ্চলে কৃষকনেতা নূরলদীন ও লালমনির নামে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। কৃষকদের মণিকোটায় চিরজাগরুক তাদের নেতা নূরলদীন।

সহায়ক সূত্র

১. *ভারতের ইতিহাস*– শ্রী অতুল চন্দ্র রায়।

২. *কোচবিহারের ইতিহাস*- আমানতউল্লাহ খান চৌধুরী।

৩. *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*- সুপ্রকাশ রায়।

৪. *রংপুর জেলার ইতিহাস*-সম্পাদনা জেলা প্রশাসক রংপুর।

৫. *রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড)- ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান।

৬. *চার শতাব্দীর লালমনিরহাট*– ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান।

৭. *পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামরে পাদপীঠ*– হায়দার আলী চৌধুরী।

৮. *দেবী চৌধুরানী* (উপন্যাস)–বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৯. আবার জেগেছে জঙ্গগুর (স্মরণিকা)– নবাব নুর উদ্দিন বাকের জঙ্গ ইতিহাস পরিষদ, রংপুর।

১০. *নূরলদীনের সারাজীবন* (কাব্যনাট্য)– সৈয়দ শামসুল হক

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আলোর মনি, লালমনিরহাট

বাঙালির হৃদপুরে

মাকিদ হায়দার

কতিপয় দুষ্টু মানুষেরা খুবই চেষ্টা করেছিল
টুঙ্গিপাড়ার সেই মাঝিমাল্লার নাম
চিরতরে মুছে দিতে।
যেন কেউ বলতে না পারে
শেখ মুজিব নামের কেউ ছিল
এই বাংলায়
এই দেশে।
কেউ কেউ বলেছিল–
শেখ লুৎফরের ছেলের নাম
আজ থেকে ভুলে যেতে হবে
অফিস-আদালতে কোথাও
নেওয়া যাবে না খোকা নামধারী
কেউ ছিল এই দেশে কোনোদিন।
আমরা সবাই জানি–
শেখ লুৎফর রহমানের ছেলে
শেখ মুজিবুর রহমান
রয়েছে থাকবে আকাশে-বাতাসে
বাঙালির হৃদয় মন্দিরে।

রৌদ্রের সোপান

দুখু বাঙাল

আকাশের তলে আর সমুদ্রের তীরে এসে যখন
দাঁড়ালেন সমুদ্রপুরুষ
গোটা দৃশ্যটাই হয়ে উঠল নিখুঁত এবং শোভনীয়
তাঁকে দেখামাত্রই দশ লক্ষ উদ্বেলিত ঢেউ
অকস্মাৎ হয়ে উঠল পারস্যের ঘোড়া
এবং বার বার আছড়ে পড়ল সমুদ্রের প্রশস্ত চড়ায়।
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
এই বলে তাঁর কাব্যকথা শেষ হতেই
শেষের শব্দগুলো হয়ে উঠল শতশতাব্দীর পরম্পরা।
দশ লক্ষ উদ্বেলিত ঢেউ নিজ নিজ গামছায়
কিংবা চাদরে পেঁচিয়ে ফেলল এই সীমিত শব্দকটি
অতঃপর রেসকোর্সের ময়দান ছেড়ে বিপ্লবী ঢেউগুলো
আশার বোচকা মাথায় হাসতে হাসতে ধরল বাড়ির পথ
তারা বুঝে গেল এই আশার বোচকাটা বুকে চেপে
এবার ঠিক যুদ্ধে যেতে হবে।
বাড়িফেরার পথে বোচকাগুলো কিছুতেই মাথায় থাকল না আর
তারা ছুটতে থাকল বাড়ির পথে
বিশ্বস্ত কুকুরের মতো পথপ্রদর্শক হয়ে
ঢেউয়ের আগেই তারা পৌঁছে গেল নিজ নিজ বাড়ির উঠোনে
অতঃপর শীতের প্রত্যুষে একদিন সবগুলো রক্তনদী এক হয়ে
সহসাই হয়ে উঠল রৌদ্রের সোপান।

সেই ভাষণ

ফারুক নওয়াজ

একাত্তরের সাতই মার্চে ঘরে তো ছিল না কেউ...
রেসকোর্সের মাঠে নেমেছিল গণজোয়ারের ঢেউ।
স্বদেশসুদ্ধ কণ্ঠরুদ্ধ অধীর অপেক্ষায়...
মধ্যদুপুর সূর্য উপুড় সময় গড়িয়ে যায়।
নেতা আসছেন– নেতা একজনই একজাতি বাঙালির
উঁচু মঞ্চেই নেতা উঠবেন চিরউন্নত শির।
নেতা বলবেন... কী যে বলবেন, কী যে নির্দেশ দেন–
জাতি প্রস্তুত রণে ছুটবেই বাজলেই সাইরেন।
ধীরপায়ে বীর দাঁড়ালেন যেন শিখর হিমাদ্রির...
যেন দেবদূত পথ দেখাবেন কাঙ্ক্ষিত মুক্তির।
নেতা দাঁড়াতেই মহা-উল্লাস লাখো কণ্ঠের ঝড়...
জয়-জয়-জয় বঙ্গবন্ধু... আকাশ কাঁপানো স্বর!
নেতা– নেতা নয়, যেন হিমালয়; নেতা নাড়ালেন হাত
নেতা তাকাতেই গণগর্জন থামল অকস্মাৎ।
'ভাইয়েরা আমার'...বলতেই নেতা হাওয়া তোলে মৃদু ঢেউ–
ধীরে ধীরে নেতা যে-কথা শোনান; আগে তা শোনেনি কেউ।
কখনো কণ্ঠ মৃদু-মন্থর, কখনো বজ্রনাদ...
কখনো স্নিগ্ধ বাণী-নির্ঝর, কখনো-বা প্রতিবাদ।
কথা না কবিতা, কবিতা না কথা– অপরূপ বিস্ময়...
ভাষণ কখনো শিল্পিত আর ছন্দোবদ্ধ হয়?
কখনো পয়ার– মহাকাব্যের গম্ভীর বীরভাষা...
কখনো মেদুর স্বরবৃত্তের দোল জাগানিয়া আশা।
কখনো সে-কথা মাত্রাবৃত্তে আবেগমথিত বাণী...
কখনো আবার রেখতা ছন্দে দিয়ে যায় ঝলকানি।
কখনো সে-কথা মৃদু-মৃদঙ্গ, কখনো লাচাড়ি ধাঁচে...
কখনো-কখনো গড়রা ছন্দে আগুনের মতো নাচে।
ভাষণ নয়তো অমোঘ মন্ত্র– মন্দাক্রান্তা-গাথা...
সেই সে ছন্দে সাহসে দুলল সাড়ে সাত কোটি মাথা।
পৃথিবী অবাক– এ যে বিস্ময়! কী ভাষণ দিল কবি...
সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল সেই সে কবির ছবি।
ছবির কবির নির্দেশে জাতি শত্রুর সাথে লড়ে–
বিজয়-পতাকা উড়িয়ে নতুন মহা-ইতিহাস গড়ে!
দুনিয়া কাঁপানো সে-ভাষণ আজ শুধুই ভাষণ নয়...
ঐতিহাসিক বিশ্ব দলিলে হলো চির-অক্ষয়!

মুজিব ছবি

গোলাম নবী পান্না

এই দেশেরই মুক্ত হাওয়ায়
একটি মানুষ খুঁজি
ফ্ল্যাশ ছাড়াই ছবিটা পাই
দু'চোখ যখন বুজি।
প্রশ্ন লুকায় মনের মেলায়
জবাব মেলে শত
অবাক হয়ে ভাবি শুধু
তাঁকে নিয়ে যত।
ভাবুক নদীর কূলে এসে
ভাসে তাঁর-ই ছবি
'মুজিব' ছবি ভাবতে গিয়ে
হয়ে গেলাম কবি।

আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা

আরিফ মঈনুদ্দীন

আমি বেঁচে আছি আমার রক্তধারায়
বহমান ইঙ্গিতে প্রবহমান স্রোতের কৃপায়।
অবোধ কালের ঘেরাটোপ পেরিয়ে যখন
একটু একটু করে খুলেছিল বুদ্ধির কপাট–
আমিও বুঝতে এবং জানতে শিখেছিলাম আমার অধিকার-স্বাধিকার
স্বপ্নের চেরাগ হাতে, 'সেই স্বপ্ন যা ঘুমুতে দেয় না'
আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ফকির মজনু শাহ
ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্
আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিহতের আরেক ভাষা–
বাঁশের কেল্লার সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর
আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহী সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে
ইংরেজ-আদেশ অমান্যকারী ভারতীয় সিপাহী ঈশ্বরী প্রসাদ পাণ্ডে
আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নেতা
মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্র
অতঃপর আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক
গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
তারপর আরেক জ্বলজ্বলে ইতিহাস–
বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের উজ্জ্বল প্রদীপ হাতে
আমাদের সামনে দ্বিধা সংকোচ বেদনাহীন দাঁড়িয়ে গেলেন এক মহিরুহ
নিখুঁত স্বপ্নের ফেরিওয়ালা–
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
যাঁর শক্তিমান তর্জনীর অমোঘ বাণী মুহূর্তেই পৌঁছে গিয়েছিল
পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কাছে
যে শক্তিমান তর্জনীর ইশারায় জ্বলে উঠেছিল চেতনার অগ্নিশিখা
অতঃপর নয় মাস পরে একদিন
শোষিতের পক্ষের এই বরপুত্রের হাত ধরে আমাদের সামনে দাঁড়াল
এক জীবনের চাওয়া-পাওয়া–শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস ভেঙে
নতুন এক অধ্যায়– যার নাম স্বাধীনতা
আমার প্রিয় স্বাধীনতা, আপনার প্রিয় স্বাধীনতা
আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

সেলাম পিতাজী

গোবিন্দলাল সরকার

তোমার নামেতে শপথ নিয়েছি আজ
সোনার দেশেতে তুমিই রাজাধিরাজ
ত্যাগের মহিমা জীবন প্রভাতে মেশা
নদী মধুমতী তোমার শৈশব ঘেঁষা
মানুষের ভাষা সবটুকু বুকে ধরে
জীবনের দাম সব তুচ্ছজ্ঞান করে
ওই বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতা-ধ্বনি হেঁকে
মুক্তির তিলক অভাগী কপালে এঁকে-
বিধাতার কাছে করেছিলে অনুনয়
'জয় বাংলা'– এই বাংলার হোক জয়;
বৃথাই যায়নি সেদিনের সেই কল্প
তুমিই শেখালে স্বাধীনতা নামে গল্প
সেলাম পিতাজী সেলাম এ জন্মদিনে
স্বাধীনতা আসে কাল-কালান্তর চিনে।

স্বদেশের মুখ

সোহরাব পাশা

নিঝুম রাত্রির শেষে ডাকে ওই সুবর্ণ সকাল
চারদিকে জেগে আছে দেখ ঘুম ভাঙানো পাখিরা
মেঘলা সন্ধ্যায় বিরুদ্ধ হাওয়ায় মাথা নত করে না এদেশ
শহিদমিনারগুলো অনুবাদ করে প্রাণের পঙ্‌ক্তিমালা
ওরা আঁধার রাতের দৃপ্ত আলোর মিছিল–অমিত সাহস
জ্যোতির্ময় বাতিঘর
এইখানে জ্বলে ক্ষিপ্র সূর্যের অপূর্ব চিত্রকল্প
অমিতাভ চেতনায় বিনিদ্র রবীন্দ্র-নজরুল
রংধনু রোদের শব্দে আঁকা সেরা কবি জয়নুল
এইখানে হঠাৎ বিষণ্ন রাত্রি নামে–বেদনায়
পাখিরাও ভুলে যায় ডানায় রচিত স্বপ্নভাষা
পঁচাত্তরে পনেরো আগস্ট শোকভেজা স্বরলিপি
আমার প্রাণের বর্ণমালা আর স্বদেশের মাটি
নিরন্তর জ্বলে অনির্বাণ শিখা শোকের দহন
এখনো উদ্ধত ওই বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত তর্জনী।
বঙ্গবন্ধুর নামে হেসে ওঠে প্রিয় বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা, আরো চির আয়ুষ্মান হও

হাসান হাফিজ

মুক্ত দোয়েলের শিসে শুনতে পাই
সুরের মূর্ছনামুগ্ধ স্বরলিপি
মৃত্তিকায় মিশে আছে শহিদের পবিত্র রুধির
গাঙ্গেয় বদ্বীপ সেই অহংকৃত ঐতিহ্যে উজ্জ্বল
স্বাধীনতা এ রকমই অবারিত আকাশের নীল
শাপলার বিকশিত সানন্দ উচ্ছ্বাস
স্বাধীনতা, তুমি কী জলের তলে ইলিশের বর্ণচ্ছটা
কখনো বা সুন্দরবনের জেদি বাঘের গর্জন
জাতীয় ফলের ঘ্রাণ পরিপুষ্ট কাঁঠালের
মৃদুমন্দ ঝিরিঝিরি সুগন্ধ উতলা
সবচেয়ে দীপ্র আর স্বতঃস্ফূর্ত কোনখানে তুমি
কোনখানে তুমি স্বচ্ছ স্বাভাবিক সগর্ব উদ্ভাস?
তুমি কেন এত প্রিয় এত বেশি আকাঙ্ক্ষিত
কেন এত তৃষিত অধীর শোকে গর্বে মহীয়ান?
পতাকার জমিনসবুজে আর লাল বৃত্তে
লাখো শহিদের আত্মা যেইখানে মূর্ত চিরঞ্জীব
সেখানে আমার স্থিতি আমাদের আনন্দিত অভিষেক
স্বাধীনতা হও তুমি আরো দীপ্র আরো চির আয়ুষ্মান...

কদ্দুর

সানজীদ নিশান চৌধুরী

লোনা নদীর স্রোত জাল চিরে
শক্ত হাতে বৈঠা বাইছে ইছামতীর তীরে ধীরে
অবুঝ মাঝিরা যাবে কদ্দুর
গন্তব্য অজানা– অদেখা অচিনপুর
অচিনপুরের নানা রঙের বাসিন্দা
ভালো-মন্দ করি প্রশংসা ও নিন্দা
হেঁইয়ো ভাইরে চল ত্বরা বাই
ডাক ভাবুক মন মাঝারের সাঁই।

ত্রিশ লক্ষ প্রভাত

গাজী রফিক

এই মানচিত্রটি আকাশেই আঁকা ছিল
ষড়ঋতু শস্য-শ্যামলা বাংলা
মেঘের প্রেক্ষাপটে
আরো কত নদনদীর প্রস্তাবনায়;
দিক-দিগন্তে অতীত মিলেছে প্রেমের বিশ্লেষণে।
স্বপ্ন ছুঁয়েছিল পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলরং
এই ১৯৭১-এ, অবশেষে একটি নতুন সূর্য এসে
আগুন রঙে জ্বেলে, এই মানচিত্রটি
মাটিতে নামিয়ে আনে।
কী আশ্চর্য... ত্রিশ লক্ষ প্রাণ বলিদান শেষে
যেন ত্রিশ লক্ষ প্রভাত মিলিত হলো
হলো রক্তিমাভ একটি সূর্যোদয়ে:
সাড়ে সাত কোটি হৃদয়ে হৃদয়ে লিখিত বাংলাদেশ।

তিনিই জাতির পিতা

জাহানারা জানি

চারদিকে সবুজ ঘেরা মাঝখানে লাল সূর্য
এই পতাকা আনতে গিয়ে বাজলো রণতূর্য
ত্রিশ লক্ষ মুক্তিসেনা ঢেলে বুকের রক্ত
বুঝিয়ে দিল বীর বাঙালি ভীষণ স্বদেশ ভক্ত।
বীর তিতুমীর প্রীতিলতা কেউ ভোলেনি তাদের কথা
সূর্য সেনও জীবন দিল স্বাধীনতার জন্য
স্বাধীনতার যাত্রাপথে ওরাই আগে মান্য
ভাষা শহিদ সালাম-বরকত-রফিক-জব্বার
অমর হয়ে আছেন ওরা হৃদয়জুড়ে সব্বার
পাক শাসকের অত্যাচারে জাতির জীবন জর্জর।
তরুণ নেতা শেখ মুজিবের বুকে ওঠে বজ্রঝড়
গুরু যে তাঁর প্রবীণ নেতা সোহরাওয়ার্দী দিলেন বর
ওরে মুজিব দামাল ছেলে দেশমাতাকে রক্ষা কর
মিছিল মিটিং আন্দোলনে ডাকের পরে দিলেন ডাক
দেশ জাতিকে করতে স্বাধীন ঘরকে মুজিব করেন পর
বাঙালিদের নেতা মুজিব মায়ের গলার মণিহার
জীবন দিয়েও আনবে মুজিব ফিরিয়ে মায়ের স্বাধিকার।
দেশ জনতার সমর্থনে সত্তরেতে ভোট হলো
নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু এক চেটিয়া ভোট পেলো
সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে এবার গঠন করবেন সরকার
ইয়াহিয়ার তালবাহানা ক্ষমতা ছাড়তে চাই না আর
৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দিলেন ডাক
তাঁর ডাকেতে বীর বাঙালি যুদ্ধ করে নয়টি মাস
হটিয়ে দিয়ে পাকহানাদার
বাজিয়ে এল বিজয় শাঁখ
কার ডাকেতে লক্ষ সেনা রণাঙ্গনে দিল প্রাণ
তিনিই হলেন জাতির পিতা
শেখ মুজিবুর রহমান।

এ তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশ

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

তুমি দেখতে পাচ্ছো তোমার জন্মশতবর্ষের আয়োজন!
শিশুর রংতুলিতে তোমার মুখ ভেসে ওঠে যখন
তখন তোমার দীপ্ত কণ্ঠস্বরই ইথারে ছড়িয়ে পড়ে।
জাগে পুণ্ড্র গৌড় সমতট, জাগে লাল-সবুজের জমিন
তোমার দেওয়া অধিকার জেগে থাকে পৃথিবীর মানচিত্রে।
একটি ক্ষুধার্ত মানবগোষ্ঠী, যাদের পিতা হয়ে
একমুঠো ভাতের অধিকার চেয়ে লড়াই করেছিলে
আজীবন যে যুদ্ধ ছিল তোমার বুকের ভেতর
হায়েনার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছো বার বার
যোজন যোজন অন্ধকারে কেটেছে তোমার সোনালি প্রহর
সেই জাতি এখন ক্ষুধার্ত মানুষের মাঝে ভাত বিলি করে।
তুমি দেখতে পাচ্ছো তোমার জন্মশতবর্ষের আয়োজন!
এই যে তোমার স্বপ্নঘেরা ৫৬ হাজার বর্গমাইল লালজমিন
আকাশের নীল মেঘ, নদীর উত্তাল ঢেউ, শহিদের গণকবর
বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে তোমার পবিত্র রক্তের দাগ
এখনো আমরা অষ্টপ্রহর পাহারায় রেখেছি পিতা–
এখন তোমার ঘরে আঠারো কোটি শিশুর হাসি ঘুরে বেড়ায়
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত দিগন্তে আমাদের পতাকা হাঁটে
বিশ্ব দরবারে তোমার দেওয়া আসনটি সূর্যকিরণ বিকিরণ করে
সমুদ্রে জমিনে আকাশে এখন আমাদের অংশীদারিত্ব চলে
এ তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পিতা।
তুমি দেখতে পাচ্ছো তোমার জন্মশতবর্ষের আয়োজন!

স্বাধীনতার ইতিহাস

মো. কামাল শেখ

আমার একটা আকাশ আছে
আমার একটা দেশ,
লাল-সবুজের ঐ পতাকায়
বিজয়ের উন্মেষ।
আমার সবুজ মাঠ আছে
আছে নদীর কিনার,
স্বপ্নগুলো বুকের ভেতর
দীপ্ত শহিদমিনার।
রথের মেলা কলার ভেলা
পাখির কলতান,
বিজয় কেতন আছে আমার
শিখা অনির্বাণ।
আমার পদ্মা-মেঘনা আছে
সাগর পাড়ের ঢেউ,
ঘরে ফেরা পথের পানে
চেয়ে থাকার কেউ।
হাজার কবির কাব্য আছে
বটের ছায়ায় হাট,
দোলনচাঁপা আছে আমার
নকশিকাঁথার মাঠ।
মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস
বুক ভরে নেই শ্বাস,
আমার আছে মহান
স্বাধীনতার ইতিহাস।

বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু

হাসানাত লোকমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
বন্ধু তিনি সবার
বন্ধু তিনি শাপলা ফুলের
বন্ধু তিনি জবার।
বন্ধু তিনি দোয়েল-শ্যামার
বন্ধু তিনি কবির
বন্ধু তিনি বাংলা ভাষার
বন্ধু তিনি রবির।
বন্ধু তিনি শ্রমিক-চাষার
বন্ধু তিনি কুলির
বন্ধু তিনি লাল-সবুজের
বন্ধু মাতৃভূমির।
বন্ধু তিনি আমার দেশের
বন্ধু সারা বিশ্বের,
বন্ধু তিনি আমজনতার
বন্ধু তিনি নিঃস্বের।

আলোর মশাল

রোকসানা গুলশান

সত্য সাহসে হও নির্ভীক
গাও যদি গান
'একলা চলো রে'–
পিছিয়ে কেন তবে?
দাঁড়াও উন্নত– হে বীর।
যে আলোর মশাল
হাতে তোমার
উত্তরাধিকার,
নিতে হবে তাদের কাছে
অন্ধকারে অপেক্ষায়– যারা স্থবির।
তিতুমীর, প্রীতিলতা, বরকত, আসাদ
নূরলদীন ও তাজউদ্দীন
কত না রক্তে রাঙা এ আগুন
তোমারই হাতে আজ–
থেকো সামনে স্থির।
নিরস্ত্র করে যারা মিথ্যাজালে
কাঁটা বিছায় পথে
হয়ো না ভীত, উঠো না কেঁপে
আছে আগুন
ছোঁড়ো সত্যের তীর।
চৌচির হয় হোক
দুর্গম যাত্রা।
'হাঁকিছে ভবিষ্যৎ' হে নবীন
রাখো বুকে সাহস
হও ধীর, যুধিষ্ঠির।

মুজিবনামা

প্রত্যয় জসীম

তুমি বেঁচে আছো
রেসকোর্স ময়দানে-উদ্যানের ঘাসে ঘাসে
স্বাধীনতা ঘোষণার সেই অবিনাশী বিকেলে
শিখা চিরন্তনের অনির্বাণ চেতনায়
তুমি বেঁচে আছো
সাত মার্চের উত্তাল জনসাগরের স্রোতে
ষোলো ডিসেম্বরের দুনিয়া কাঁপানো বিজয়ের গৌরবে
তুমি বেঁচে আছো
পনেরো আগস্টের ঝরা গোলাপের কান্নায়
ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের দেহজুড়ে
তুমি বেঁচে আছো
লেকের জলে ঢেউয়ের কাঁপনে কাঁপনে
ঝরা বকুলের নীরব সুগন্ধে পলাশের রঙে রঙে
তুমি বেঁচে আছো
শহিদমিনারের বেদিতে বেদিতে
অপরাজেয় বাংলার পাথুরে দেহে
তুমি বেঁচে আছো
বাল্মীকি-লালন-রবীন্দ্র-নজরুলের অমর সৃষ্টিতে
বাংলা ভাষার সকল ধ্বনি আর বর্ণমালায়
তুমি বেঁচে আছো
আজ ও আগামী দিনের প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায়
তরুণ কবির স্বপ্নমাখা রাত-জাগা কলমের ঠোঁটে
তুমি বেঁচে আছো
নাফ নদী আর সেন্টমার্টিনের প্রবালে প্রবালে
সবুজ শ্যামল নারকেল বীথির ঝিকিমিকি আলোয়
তুমি বেঁচে আছো
সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দুর্জয় ক্ষিপ্রতায়
পদ্মা-মেঘনার ঝাঁক ঝাঁক ইলিশের রুপালি ঝিলিকে
তুমি বেঁচে আছো
আকাশ ভরা তারাদের উজ্জ্বল আলোয়
শ্রাবণ মেঘের অবিরাম বৃষ্টির কান্নায়
তুমি বেঁচে আছো
জুঁই-চামেলি-চাঁপা-গন্ধরাজ-হাসনাহেনা
রজনীগন্ধা-গোলাপ-বকুল-মহুয়ার মাতাল সুগন্ধে
তুমি বেঁচে আছো
জয়নুল-সুলতান-শাহাবুদ্দিনের স্বপ্নের তুলিতে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের দ্যুতিময় চেতনায়
তুমি বেঁচে আছো
ঐ পতাকার সমস্ত ক্যানভাসজুড়ে
প্রতিটি বাঙালির মানসপিতা জাতিরপিতা হয়ে।

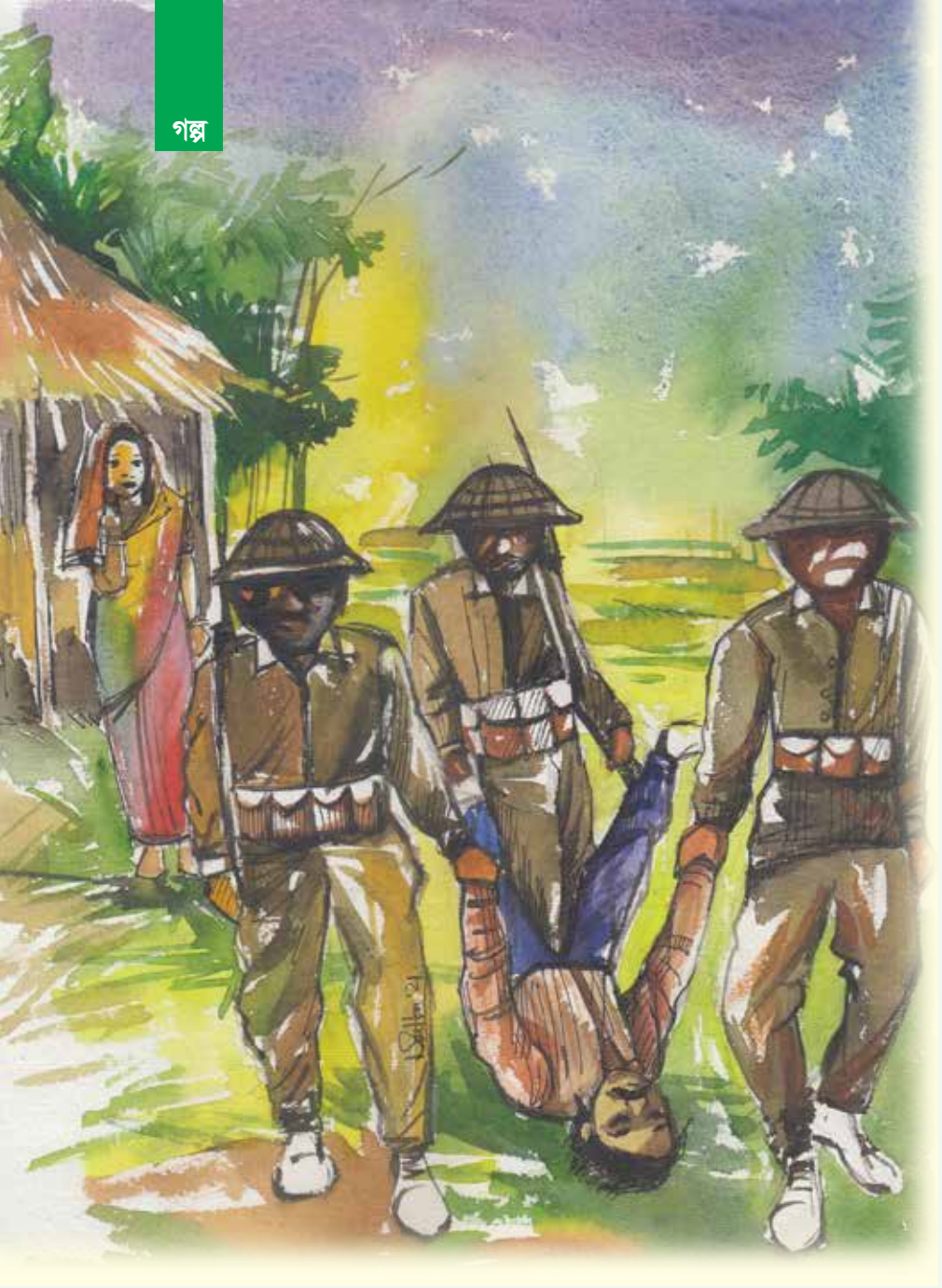

মুজিবের তর্জনী

আফরোজা পারভীন

বিশাল প্যান্ডেল টানানো হয়েছে। ঢাকা থেকে দুদিন পর পর মন্ত্রীরা আসছেন আয়োজন পরিদর্শন করতে। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দিন-রাত নেই। অবিরাম খেটে চলেছেন তারা। কোথাও যেন কোনো খামতি না থাকে, যেন হয় নিঁখুত-নিপাট ব্যবস্থা। হেলিকপ্টার নামা, সার্কিট হাউসে নেওয়া, বিশ্রাম, খাবার-দাবার, সভাস্থল, ফুল-মালা সব যেন হয় মনোরম। সভায় যেন তিল ধারণের ঠাঁই না থাকে সেদিকে নজর রাখছেন স্থানীয় নেতারা। লিডার খুশি হলে তবেই না ভাগ্য খুলবে তাদের। ডিসি স্বপ্ন দেখছেন, মন্ত্রীকে খুশি করতে পারলে নিশ্চয়ই তার ভালো পোস্টিং হবে। পোস্টিং হবে আরো কোনো বড়ো জেলায়। একই স্বপ্ন দেখছেন জেলা পুলিশ সুপার। স্থানীয় এমপির স্বপ্ন লিডারকে খুশি করতে পারলে নিদেনপক্ষে একটা প্রতিমন্ত্রী হবার সুযোগ হয়ত হতে পারে। এলাকায় কোনো মন্ত্রী নেই, অনুন্নত এলাকা। মন্ত্রী হলে তিনি বদলে দেবেন এলাকার চেহারা। কেন্দ্রে চেনা-জানা, কাছের লোকদের বুঝাচ্ছেন তিনি এ কথা। যেন একটিবার তারা লিডারকে বলেন তার বিষয়ে। এতদিন রাজনীতি করছেন, একবার মন্ত্রী না হলে কী মানায়! এলাকার লোকের কত আশা ভরসা তাকে নিয়ে। এলাকার গ্রহণযোগ্য মানুষের কয়েকজনকে ঠিক করে রেখেছেন সভা শেষে অথবা সুযোগ পেলে সার্কিট হাউসে তারা মাননীয়কে বলবেন এমপির গুণপনার কথা। আবদার করবেন তাকে মন্ত্রী বানাবার। তরুণ কর্মীরা বলছে, প্রয়োজনে বাস ভাড়া করে ঢাকা অবধি যাবে তারা। এবার তাদের মন্ত্রিত্ব চাই-ই চাই।

কেন্দ্র থেকে খাবারের লিস্ট এসেছে। তিনি কী খান কী খান না তার ফর্দ। তিনি কী ভালোবাসেন কী ভালোবাসেন না তার ফর্দ। থাকবেনই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা তারজন্য চিন্তার অবধি নেই প্রশাসনের। বাথরুম পছন্দ হবে কিনা, বিছানা পছন্দ হবে কিনা, খাবার পছন্দ হবে কিনা কে জানে। ডিসি অবশ্য জানেন বাহুল্য পছন্দ করেন না তিনি। খুব সাধারণ খাবার খান। কিন্তু তা বলে তো আর ঝুঁকি নিতে পারেন না তিনি। ঘামছেন এমপি-ডিসি-এসপি।

যাকে নিয়ে এত ভাবনা সেই মুজিব তখন ঢাকায়। সবে গণভবনে অফিসের কাজ সেরেছেন। বড্ড খাটুনি গেছে সারাটা দিন। একের পর এক মিটিং-ব্রিফিং-বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সৌজন্য সাক্ষাৎ। একটু হেলে পাইপে একটা লম্বা টান দিলেন তিনি। মনে পড়ল পাকিস্তানের জেলে থাকার দিনগুলোর কথা। তিনি যে বেঁচে ফিরবেন এ কথা না ভেবেছে তাঁর পরিবার, না ভেবেছে দেশের মানুষ, না তিনি নিজে। যাঁর ডাকে এদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলো, তাঁকে পাকিস্তানিরা বন্দি করে মেরে না ফেলে বাঁচিয়ে রাখবে এটা দুরাশা! তিনি শুধু চেয়েছিলেন মারা যাবার আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে এই খবরটা যেন পান। স্বাধীনতার স্বপ্নে কেটেছে তাঁর কত বিনিদ্র দিন-রাত। তাঁকে তো মেরে ফেলতোই। মারতে পারেনি শুধু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে।

একটা লম্বা শ্বাস ফেলেন তিনি। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে। বড়ো দাম দিয়ে কেনা এ স্বাধীনতা! কত কত প্রিয়মুখ চিরতরে হারিয়ে গেছে। আর কোনোদিন তিনি দেখতে পাবেন না তাদের। কত অচেনা অজানা মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্য রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তাদেরও তিনি কোনোদিন চিনতে পারবেন না, বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন না। এ কষ্ট তিনি বইতে পারছেন না।

রাতে ঘুম আসে না। আগে ঘুম হতো না দেশ স্বাধীন করার চিন্তায়। এখন ঘুম হয় না শহিদ ভাই-বোনদের হারানোর যাতনায়। 'তোমরা আমার বীর ভাই-বোন, আর কোনোদিন দেখতে পাবো না তোমাদের। তোমাদের রক্তে অর্জিত হলো যে দেশ সে দেশে তোমরা কোনো দিন নিশ্বাস নিতে পারবে না'– বিড়বিড় করেন তিনি। চোখ থেকে গড়িয়ে দুফোঁটা জল নামে টেবিলে। টেবিলের ওপর মাথা এলিয়ে দেন। বড়ো কষ্ট হচ্ছে তাঁর। টেবিলের কাঁচে জমছে জলের ফোঁটা। আচমকা কে যেন তার কাঁধে তপ্ত শ্বাস ফেলল। কে কে? চমকে উঠলেন তিনি। চারদিক তাকালেন। কেউ কোথাও নেই! তবে কী কোনো এক শহিদ ভাই বুঝিয়ে দিল তার অস্তিত্ব। শ্বাস ফেলে বলে গেল, 'কে বলে আমরা নেই, কে বলে আমরা এ মুক্ত মাটিতে নিশ্বাস নিই না। এ স্বাধীন দেশের পরতে পরতে আছে আমার শ্বাস, আমার অস্তিত্ব। যেমন তুমি পেলে তোমার কাঁধে।'

তিনি সোজা হয়ে বসেন। কাঁধে হাত বুলাচ্ছেন। যেন সেই অমর প্রাণের স্পর্শ নিচ্ছেন। কাল তাঁর অনেক কাজ। ঢাকার বাইরে যাবেন। দেশে ফিরে নড়াইলে এই তাঁর প্রথম জনসভা। এদেশের মুক্তিযুদ্ধে নড়াইল-যশোরবাসীর অবদান অনেক। নড়াইল-যশোরের মানুষ লড়াকু, সংগ্রামী। তেভাগা, কৃষক আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তারা। ইংরেজরা নড়াইলে অনেকগুলো নীলকুঠি বানিয়েছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এই জনপদের প্রতিটি মানুষ যেন এক একজন যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণবাজি রেখে লড়েছে তারা। যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছিল পাকিস্তানিদের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস। নড়াইল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বিশাল দল মার্চ করে যশোরে এসেছিল দা, সড়কি, বল্লম, বাঁশ এসব দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। তিনদিন যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ করে রেখেছিল মুক্তিযোদ্ধারা। 'যশোর মার্চ' ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে। অনেক বড়ো বড়ো রাজনীতিবিদ জন্ম নিয়েছেন নড়াইল-যশোরে। ত্যাগে অনন্য তারা। অনেকবার নড়াইল-যশোরে গেছেন তিনি। পেয়েছেন অফুরান ভালোবাসা, আন্তরিকতা সমর্থন। এবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যাবেন। মুজিব মনে মনে বলেন, 'পদে আমি প্রধানমন্ত্রী, আসলে আমি তোমাদের ভাই।'

চেয়ার ছেড়ে ওঠেন তিনি। বেরিয়ে আসেন রুম থেকে। বাসায় যাবেন। গাড়িতে ওঠেন ধীর পায়ে।

২

মজিদা বেগমের ছেলে ফরিদ নড়াইল ডিসি অফিসের পিয়ন। স্বামী কায়জার শহিদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। ফরিদ, মজিদা-কায়জারের একমাত্র সন্তান। সন্তানটিকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তাদের। ভালো করে মানুষ করবেন, লেখাপড়া শেখাবেন। বড়ো চাকরি করবে ছেলে। ফুটফুটে বউ আনবে। ছেলে হবে মানুষের মতো মানুষ। সারাদিন সময় পান না কায়জার-মজিদা। বাজারে ছোট্ট একটা দোকান আছে কায়জারের। আর আছে দেশের কাজ। মজিদাও সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছেলে, শাশুড়িকে দেখেন। রাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনেন।

দেশে যুদ্ধ চলছে। আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত কায়জার। শেষ নির্বাচনেও নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়েছেন। নৌকার জন্য কাজ করেছেন। পার্শ্ববর্তী চাঁচড়ায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। সেখানে নিয়মিত মহড়া নিয়েছেন কায়জার। অংশ নিয়েছেন যশোর মার্চে। মজিদাকে, মাকে, ছেলেকে কিছুটা সময় দেওয়া দরকার। দিতে পারেন না তিনি। তা নিয়ে মনে কষ্ট আছে। অপরাধবোধও আছে কিছুটা। কিন্তু দেশ তো সবার আগে!

সেদিন ১৭ই জুলাই অতর্কিতে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে রাজাকাররা। তুলে নিয়ে যায় কায়জারকে। পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন মজিদা। কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করেছিলেন স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে। রাইফেলের বাট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল তাকে পাকিস্তানিরা। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সেই যে স্বামী গেলেন আর ফেরেননি। মজিদা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নিরেট পাথর যেন। ফরিদকে নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না তার। বোবার মতো বসে থাকতেন ঘরের দাওয়ায়। সন্তান কী খেল কী খেল না কিছুই দেখতেন না। শাশুড়িও তখন শোকস্তব্ধ। তারপরও শাশুড়িই ছেলেকে দেখতেন। শুধু শহর থেকে কেউ এলে ছুটে যেতেন মজিদা। জানতে চাইতেন তার স্বামীর খবর কেউ জানে কিনা। কেউ বলত তার স্বামীকে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে, কেউ বলত যশোর ক্যান্টনমেন্টে আটকে রেখেছে। প্রতীক্ষার দিন গুনতেন মজিদা। তারপর একসময় বুঝে যান স্বামী কোনোদিন ফিরবে না। ছেলেটাও একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে। সংসারে তীব্র অভাব। ছেলেকে ঠিকমতো খাওয়াতে পারেন না। অর্থাভাবে পড়াতে পারলেন না। অষ্টম শ্রেণি পাস করার পর ছেলেকে ঢুকিয়ে দিলেন পিয়নের চাকরিতে। নড়াইল কালেক্টরেটের পিয়ন ছেলে। তা সেই ছেলে একদিন অফিস থেকে ফিরে ভাত খেতে খেতে দাদিকে বলল, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব আসবেন নড়াইলে। তার আসা নিয়ে সাজ সাজ রব চারদিকে। ছেলে সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল আয়োজনের খুঁটিনাটি। দাদি মন দিয়ে শুনছেন। দাদির সাথেই ছেলের যত গল্প। ছেলের কথা শেষ হওয়া মাত্র মজিদা বলল,

: আমি নড়াইল যাব। মুজিবের সভায় যাব।

ফরিদ অবাক। অবাক শাশুড়িও। কায়জার মারা যাবার পর মজিদা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি আগের থেকে স্বাভাবিক হলেও পুরো স্বাভাবিক নন। মাঝে মাঝেই ডুকরে কাঁদেন। পুকুর পাড়ে বসে থাকেন। খাওয়ার কথা মনে থাকে না। সারা রাত উঠোনে হাঁটেন। ফরিদ মাকে কোনোদিন নানাবাড়ি বা আশপাশের কোথাও বেড়াতে যেতে দেখেনি। অনেক বলেও কোথাও নিয়ে যেতে পারেনি। মা জোরে হাসে না, সাজে না। সেই মা বলছে নড়াইল যাবে। অবাক ফরিদ বলল,

: কেন মা তুমি সভায় যেয়ে কি করবা? ওখানে অনেক ভিড় হবে। কতক্ষণ লাগবে তার ঠিক নেই। বসার জায়গা পাবা কিনা তাও ঠিক নেই।

: আমি যাব। আমারে নিয়ে যাবি।

আর কোনো কথা না বলে মা ঘরে ঢুকে গেলেন। ফরিদ বুঝল মাকে মুজিবের জনসভায় তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কীভাবে নেবে? সেই বা ছুটি পাবে কি করে! বন্ধের দিন। কিন্তু অফিস থেকে নির্দেশ দিয়েছে সবাইকে থাকতে হবে। কীভাবে যে সে ম্যানেজ করবে!

৩

ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারের একটা দোতলা বাড়ি। খাবার টেবিল ঘিরে সবাই বসা। ফজিলাতুন নেছাকে মুজিব রেণু নামে ডাকেন। হাসিনাকে ডাকেন হাসু, রেহানাকে মুন্না। বড়ো কাঁচের বাটিতে কই মাছ। পেটভরা ডিমসমেত ইলিশের পেটিও আছে। আরো তিন চারটে আইটেম থাকলেও মুজিব কই মাছের বাটিটা টেনে নিলেন।

রেণু বলেন,

: আগেই মাছ নিলে যে। তোমার পছন্দের আরো আইটেম আছে তো। আগে তো সবজি খাবে, তারপর মাছ।

: আজ মাছই আগে খেতে ইচ্ছে করছে। আর এত আইটেম করেছ কেন? নতুন দেশ। একটা দুটো আইটেমের বেশি তো লাগে না।

: সবসময় তো তাইই করি। তুমি কতদিন পাকিস্তানের জেলে আটক ছিলে। কী খেয়েছ না খেয়েছ। তাই একটু ভালো-মন্দ করেছি।

মুজিব রেণুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

: জানো রেণু কাল নড়াইল যাব। দেশে ফেরার পর এই আমার প্রথম নড়াইল যাওয়া। আমার খাবারের পছন্দের কত বড়ো লিস্ট যে ওরা নড়াইলে পাঠিয়েছে কে জানে। এসব আমার খুব অপছন্দ। আমি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ যা খায় আমিওতো তাই খাই। ভাত-মাছ-ডাল। তারজন্য এত আয়োজন কীসের। আমার খারাপ লাগে। বলিও মাঝে মাঝে কিন্তু কাজ হয় না। রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল বড়ো মারাত্মক!

: হ্যাঁ, ওসব জোগাড়যন্তর করা তো সমস্যা। মানুষের কষ্ট হয়। তুমি খাও এক দুই পদ। রেণু বলল।

হাসিনা জয়কে নানার পাশে রাখা ছোট্ট চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। এক হাতে ওকে ধরে রাখল রাসেল। হাসিনা রেহানা চেয়ারে বসল পাশাপাশি। মুজিব জয়কে গাল টিপে আদর করলেন খেতে খেতেই। রাসেলকে মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ালেন। রাসেল বলল,

: আমি মাংস খাব।

: খাবে বাবা। শুধু মাংস খেলে কী হয়, মাছও খেতে হয়। বুঝলে শরীরের জন্য প্রয়োজন সুষম পুষ্টি। খেতে হয় শাকসবজি, ডাল আর প্রচুর পানি বুঝেছ?

বয় বাবুর্চি আছে। তবু নিজেই খাবার পরিবেশন করেন রেণু। তুলে তুলে খাওয়াতে ভীষণ আনন্দ পান তিনি। মেয়েদের ভাত ও ডাল দিতে দিতে রেণু ভাবলেন, আল্লাহর অসীম রহমতে তিনি স্বামীকে ফেরত পেয়েছেন। ২৬শে মার্চ মুজিবকে গ্রেফতার করার পর ধানমন্ডির যে বাড়িতে তাদের এরেস্ট করে রাখা হয়েছিল সেখানে কারো সাথে কথা বলতে দেওয়া হতো না। বের হতে দেওয়া হতো না। সে ছিল এক দুঃসহ জীবন। কামাল জামাল তখন যুদ্ধে। হাসু অন্তঃসত্ত্বা। কী যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি! সে সময় তাঁর একমাত্র আরাধ্য ছিল স্বামীর দেশে ফেরা আর দেশের স্বাধীনতা। মুক্ত স্বাধীন দেশ।

রেণু ভাবেন মুজিবের কথা আর খেতে খেতে মুজিব ভেবে চলেন রেণুর কথা। বড়ো ভালো মেয়ে এই রেণু। পিতৃহারা মেয়েটিকে মা নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। দুঃখে-কষ্টে অভাবে অনটনে কেটেছে তাদের জীবন। কখনো কোনো অভিযোগ করেননি রেণু সংসারের কোনো দায়দায়িত্ব মুজিবের কাঁধে চাপায়নি। জীবনের একটা বড়ো অংশ জেলে অথবা আত্মগোপনে থেকেছেন তিনি। তা নিয়ে রেণু কোনোদিন অভিযোগ করেননি। নিজের চেষ্টায় খেয়ে না খেয়ে সংসার চালিয়েছেন। যখন মুজিব গ্রেফতার হয়েছেন দেখেছেন রেণু তারজন্য সুটকেস গুছিয়ে রেখেছে। রাজনীতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিলেন রেণু। মুজিব ভাবেন, আজ যে তিনি প্রধানমন্ত্রী এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান রেণুর। রেণু সাপোর্ট না দিলে তিনি রাজনীতি করতে পারতেন না, গণমানুষের নেতা হতে পারতেন না, স্বাধীনতার ডাক দিতে পারতেন না। ভাবতে ভাবতে আচমকা গলায় ঠেকে যায় মুজিবের। কাশতে থাকেন তিনি। রেণু পানির গ্লাস এগিয়ে দেন। মুজিবের পিঠে চাপড় দেন। একসময় কাশি থেমে যায়। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েন তিনি। রেণু পেছনে যেতে যেতে বলেন, শুয়ে পড়ো। আজ আর রাত জেগো না। কাল তোমার অনেক কাজ।

মুজিব যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান। এগিয়ে যান রেলিং-এর দিকে। রেণু পেছন থেকে বলেন,

: কী হলো থামলে যে?

: রেণু এদিকে আসো। দেখ।

রেণু মুজিবের পাশে দাঁড়ায়। মুজিব রেণুর কাঁধে হাত রাখেন। আকাশজুড়ে জোছনার ঢল নেমেছে। আদিগন্ত প্লাবিত সে জোছনা এক অপার মুগ্ধতায় ছেয়ে ফেলে মুজিবকে। মুজিব জোরে জোরে আউড়াতে থাকেন,

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থি।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগাঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।
হাসু, মুন্না এসে দাঁড়ায় তাঁর পাশে। মুন্না গেয়ে ওঠে,
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো
ও রজনীগন্ধ্যা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।

হাসু গলায় মেলায় সে গানে।

অঝোর জোছনায় স্নাত হতে থাকে চারজন। রাত এগিয়ে চলে তার নিজস্ব পথে।

৪

হেলিকপ্টার থেকে নামলেন মুজিব। দৃপ্ত পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন গার্ড অব অনার দেবার জায়গায়। সালাম নেওয়া শেষে হাঁটতে শুরু করলেন। ডিসি-এসপি এগিয়ে এলেন,

: স্যার একটু রেস্ট নিয়ে নিলে হতো না। সব ব্যবস্থা করা আছে। সভার তো কিছু সময় এখনো বাকি।

মুজিব ঘড়ি দেখলেন। একবার ভাবলেন সার্কিট হাউসে গিয়ে রেস্ট নিয়ে আসবেন। পর মুহূর্তে বাতিল করলেন সে চিন্তা। জনগণ সারা জীবন নেতাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। আজ না হয় তিনি জনগণের জন্য অপেক্ষা করবেন। বললেন,

: সভাস্থলে চলেন।

মুজিব সভাস্থলে প্রবেশ করা মাত্র স্লোগান উঠল, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। জনতার মাঝে বাধভাঙা উল্লাস। সবাই এক নজর লিডারকে দেখতে চায়।

অনেকে বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। পেছনের লোকেরা টান দিয়ে বসিয়ে দিলেন তাদের। মুজিব মঞ্চে উঠে হাত নাড়লেন। জনগণ উল্লাসে ফেটে পড়ল। সময়ের একটু আগেই শুরু হলো সভা। স্থানীয় নেতারা বক্তৃতা করছেন একের পর এক। জনগণ উন্মুখ হয়ে আছে কখন তাদের প্রিয়নেতা কথা বলবেন। কখন তাঁর মুখ থেকে শুনবেন আশার বাণী। একসময় নেতাদের বক্তৃতা শেষ হলো। উপস্থাপক ঘোষণা করলেন, 'এতক্ষণ যাঁর কথা শুনবার জন্য আপনারা অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। এবার বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে'। মুজিব চেয়ার থেকে উঠে পোডিয়ামের সামনে দাঁড়ালেন। জনতা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকল। স্লোগান উঠল আবারো। সে স্লোগান আর যেন থামে না। মুজিব তর্জনী উত্তোলন করতেই থেমে গেল সব স্লোগান। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'ভায়েরা আমার, আমাকে বলা হয়েছে আমি এদেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী একটা পদ। রাষ্ট্র চালাতে গেলে পদের প্রয়োজন হয়। আসলে আমি আপনাদের মুজিব, মুজিব ভাই... বক্তৃতা দিয়ে চললেন মুজিব। উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে সে বক্তৃতা।

মজিদা বেগম বসেছিলেন সভার মাঝামাঝি জায়গায় এক কোণে। ফরিদ বলেছিল,

: মা এখানে বসো না। মাঝের দিকে চল। সিট তো খালি আছে। এখান থেকে দেখতে পাবে না।

: আমার দেখার দরকার না, শোনার দরকার।

কথা শোনেনি মা। বসে পড়েছে এক কোণায়। সেখান থেকে ভালো করে মুজিবকে দেখা যায় না। মা কেন যে এখানে বসল বোঝেনি ফরিদ। মায়ের অনেক কিছুই সে বোঝে না। গ্রামের লোক বলে তার মায়ের মাথা খানিকটা খারাপ। ফরিদের অবশ্য তা মনে হয় না। আসলে অকালে স্বামী হারিয়ে মা দিশেহারা গোছের হয়ে গেছে। তবে মার অনেক কাজ সত্যিই সে বোঝে না। যেমন আজ বুঝল না। কী কষ্টে যে সে আজ ছুটি জোগাড় করেছে তা শুধু সেই জানে! কী দরকার ছিল এ সভায় আসার!

বক্তৃতার খানিকটা হবার পরই চেয়ার থেকে উঠে পড়ে মজিদা। সামনের দিকে এগোতে থাকে। ভলেন্টিয়াররা বাধা দেয়।

: বসুন বসুন উঠছেন কেন?

: আমি সামনে যাব।

: এখন সামনে যাওয়া যাবে না। বক্তৃতা চলছে।

: আমি মুজিবের সাথে দেখা করব। বক্তৃতা শেষ হলেই তো উনি চলে যাবেন। ওনাকে পাব না। আমাকে যেতে দাও বাবারা।

ভলেন্টিয়াররা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাইয়ি করে।

: মুজিব মানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন আপনি? সেটা কি করে সম্ভব? আর কেনই বা দেখা করবেন?

: আমার দরকার আছে। সম্ভব বাবারা। আমাকে যেতে দাও সামনে। উনি ঠিকই দেখা করবেন।

ফরিদ অনেক চেষ্টা করেও মাকে থামাতে পারে না। ওর ভয় করে। না জানি কী কাণ্ড আজ ঘটে। মৃদু হৈ চৈ শুরু হয়। মুজিবের বক্তৃতা তখন শেষের দিকে। উনি বক্তৃতা করতে করতেই লক্ষ করেন কিছু একটা ঘটছে। বক্তৃতা থামিয়ে বলেন,

: কী হয়েছে, কী ঘটেছে?

কেউ কথা বলে না। ডিসি-এসপি-এমপি ছুটে আসেন। তারা মজিদাকে থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মজিদা ওনাদের দেখে আরো ব্যাকুল হয়ে বলে,

: আমাকে ওরা মুজিবের কাছে যেতে দিচ্ছে না। আমি মুজিবের সাথে কথা বলব।

মঞ্চ থেকে মুজিব আবারো বলেন,

: কী হয়েছে?

এবার মঞ্চে ছুটে যায় এমপি-ডিসি-এসপি। মুজিবকে ভয়ে ভয়ে বলে,

: স্যার, এক মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। সম্ভবত মাথা খারাপ। সরি স্যার কীভাবে যেন এই মাথা খারাপ মহিলা সভায় ঢুকে গেছে।

: মাথা খারাপ জানলেন কী করে? আমি ওনার কথা শুনব বক্তৃতা শেষ করে। ওনাকে সামনে নিয়ে আসুন।

মুজিবের বক্তৃতা চলতে থাকে। মজিদা বেগমকে সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। ভয়ে ভয়ে সাথে এল ফরিদ। কটমট করে সবাই তাকায় ওর দিকে। কী এক বিপদে ওদের ফেলেছে আজ এই মহিলা!

মুজিব বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে মজিদার সামনে দাঁড়ান।

: কী হয়েছে বোন, কী বলবেন?

: আমি তুলারামপুরে থাকি। আমার স্বামী কায়জার রহমান তরফদার মুক্তিযুদ্ধে শহিদ।

: হ্যাঁ, জানি। আমি তুলারামপুরের সেই মর্মান্তিক কাহিনি শুনেছি। জীবন্ত সমাধি দিয়েছে কায়জারকে আমার রাজনীতি করত এই অপরাধে। আমি দুঃখিত বোন!

মজিদা বেগম হতভম্ব! হতভম্ব ফরিদ!

: আপনি আমার স্বামীকে চিনতেন? আমার স্বামী ঠিকই বলতেন, আপনি এক অসাধারণ নেতা। আমার স্বামী বলতেন, আপনার অঙুলি নির্দেশে সে দেশের কাজে নেমেছে। আপনার অঙুলি নির্দেশে সে জীবন দিতে পারে।

: কিন্তু বোন, আপনি কেন আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন?

: কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কিচ্ছু চাইতে আসিনি। আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অঙুলি কী? সে বলেছিল, আঙুল। আপনার যে আঙুলের নির্দেশে সে জীবন দিল আমি সেই আঙুল একবার ধরতে চাই।

মুজিব তাঁর আঙুলগুলো মজিদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। একহাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মজিদা একটি একটি করে আঙুল স্পর্শ করে চেপে ধরলেন তাঁর তর্জনী। ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করছে। মজিদার সেদিকে কোনো খেয়াল নেই, সে চেপে ধরে আছে মুজিবের তর্জনী!

বঙ্গবন্ধু তোমার জন্মদিনে

খান আসাদুজ্জামান

সতেরো মার্চ এলে ধরায়
বনেদি বাঙালির ঘরে
শত স্বপ্ন এনেছিলে বুঝি
তোমারই নয়ন ভরে।
তুখোড় তুমি শিক্ষা জীবনে
মুখর আড্ডার মণি
বঞ্চিত বাঙালির অধিকার লাগি
ছিলে, বজ্রকণ্ঠ ধ্বনি।
ভয় পেয়ে তাই উর্দুওয়ালারা
ষড়যন্ত্র যত আঁকে
আগরতলার ফাঁদ পেতে ওরা
মিথ্যে মামলা হাঁকে।
সাতষট্টি-আটষট্টির গণজোয়ার তুমি
কাঁপিয়ে দিলে দেশ
উনসত্তরে বিস্ফোরণ তার
পালটায় পরিবেশ।
সত্তরে পেলে ভোটের লড়ায়ে
নিরুঙ্কুশ বিজয়মালা
উর্দুওয়ালাদের তাই না দেখে
চোখ-মুখ হলো কালা।
ডাকলো না পার্লামেন্ট সেশন কোনো
টালবাহানার চালে
পঁচিশ মার্চের রাত্রিতে তাই
দুর্যোগ বাঙালির ভালে।
লক্ষ লক্ষ বাঙালি নিধন
গুলিতে আগুনে হলো
নিরীহ বাঙালি বেঘোরেই যেন
নারী-পুরুষ বহু মলো।
তারপর...
নয়টি মাসের সংগ্রাম শেষে
চূড়ান্ত বিজয় এলো
একাত্তরের ডিসেম্বরে
বাঙালি স্বাধীন হলো।
মহান নেতা জাতির পিতা
বাংলার ধরিলে হাল
পঁচাত্তরেই বিপথগামীরা
ছিঁড়ে ফেলে নয়া পাল।
অবদান তোমার কণ্ঠ তোমার
ক্ষণিক দিয়েছে রুখে
তবু, কোটি বাঙালির কণ্ঠে কণ্ঠে
আজো, রয়েছো যে বুকে বুকে।

বুক পকেটে টুঙ্গিপাড়ার মাটি

মুস্তাফিজ শফি

কতটা গড়িয়েছে বুড়িগঙ্গার পানি,
কতটা গড়িয়েছে মধুমতীর জল–
তবুও কি মুছলো রক্তের দাগ,
রক্তগঙ্গা তবুও কি মিশলো বঙ্গোপসাগরে?
কতটা বছর পেরোলে পরে মানুষ ভুলে রক্তের স্মৃতি,
কতটা কাল পেরোলে পরে ইতিহাস ফেরে
নিজস্ব কক্ষপথে– নীরব প্রতিশোধে?
যখন শ্রাবণের অন্ধ রাতে নপুংসক ঘাতকের বুলেট
ঝাঝরা করে দেয় মাতৃভূমির বুক,
যখন ৩২-এর সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে
কোটি মানুষের ভালোবাসার বজ্রধ্বনি জয় বাংলা,
যখন গাঢ় কালো রং বিস্তৃত হতে হতে
খেয়ে ফেলে পতাকার সবুজ–
তখনো কি তুমি ভেবেছিলে, এই দিন একদিন
ফিরবে অন্য দিন হয়ে?
তখনো কি তুমি বুকের ভেতর পুষেছিলে বারুদ–
নামেই শুধু অস্ত্র নয়, পিতার খুনের প্রতিশোধ?
বুক পকেটে এখনো আছে টুঙ্গিপাড়ার একমুটো মাটি।
সেই কবে দীর্ঘশ্বাস চাপা রেখে কেউ একজন বলেছিল–
ভালোবেসে আগলে রেখো, এ মাটিই তোমাকে সাহসী করবে।
রক্তের দাগ মুছে না যেমন, চেতনা হয় না শেষ–
মাটির সাহসে লাশকাটা ঘর হয়ে সবুজে ফিরেছে দেশ।

স্বপ্নমৃত্যু প্রসারণ

পিয়াস মজিদ

গ্রীষ্মেও
মুষলধারে কাঁদছে আকাশ;
কান্নাপ্রণালি
কোনো ঋতু মানে না।
দিগন্তপাতালে
রন্ধনশালার বিস্তার তার।
এর মাঝে আমি এক
ঋজুরেখ নক্ষত্রবাদি,
এই ক্রন্দন সিম্ফনির
কারুকাঠামো ভেদ করে
শুক-স্বাতী-অরুন্ধতীর
হৃৎমহলে যাই;
দেখে আসি
এক একটি নক্ষত্রের
নির্মাণ শেষে
তোমার চোখের জল
কত যুগের
বর্ষা হয়ে
ঝুলে থাকে
অনন্ত
অন্তহীনে!

ইতিহাস বদলেছে একাত্তরে

নাহার আহমেদ

কী করে ভুলব মুক্তিযুদ্ধ?
রক্তস্নাত সংগ্রামী সেই
আগুন ঝরা দিন।
বিভীষিকাময় নয়টি মাস
যন্ত্রণা আর বীর বাঙালির ঋণ।
শিউরে উঠা বীভৎসতা
পাহাড় সমান বর্বরতা
জমাট বাঁধা আজো স্মৃতির কুণ্ডলীতে।
আমরা বাঙালি শোষিত ছিলাম
হাজার বছর ধরে।
এ মাটি-আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠে
মুক্তির বিউগল।
চল্ চল্ চল্ মুক্তিযুদ্ধে চল্।
কান্নারা আজ ক্লান্ত। জমে আছে চোখের কোণে
ছেলেহারা মার রক্তক্ষরণ বুকের পাঁজরে।
বধ্যভূমির অগণিত লাশের স্তূপ।
মুক্তিযোদ্ধাদের সেই বিজয়ের হাসি
আজ হীরের দ্যুতি ছড়ায়।
মিলিয়ে গেছে ধীরে ধীরে হাহাকারের সুর।
একাত্তরের কলঙ্ক। বদলে গেল ইতিহাস।
লাল-সবুজের পতাকা উড়াই।
প্রশান্তিতে বাংলা মায়ের আঁচল।
বুকেতে জড়াই।

বীরাঙ্গনা

শিল্পী ভদ্র

মহান মুক্তিযোদ্ধা মা 'বীরাঙ্গনা'
বল মা বীরাঙ্গনা,
তোমার কি দোষ!
তুমিতো করেছ ধারণ,
পশুদের আক্রোশ।
গঙ্গায় ধুয়ে যায়,
পাপীদের পাপ।
তাতে কি হয় গঙ্গার,
শুচিতার অভাব?
যার কালো তারই থাকে,
আলো না স্পর্শে ।
যে শিশুরা জন্মাল
তোমাদের গর্ভে,
তারা যে নিষ্পাপ,
মাগো, নির্দ্বিধায় জানবে।
নারী জাতি আর নদী,
ধুয়ে পাপ পবিত্র-নিরবধি।
তোমরাও পবিত্র গঙ্গা,
উদার, মহৎ, সর্বংসহা।
নমি তোমাদের বীর-মুক্তিযোদ্ধা,
বাংলা ও বিশ্বে তোমরা অনন্যা।
তোমাদের নিদারুণ আত্মত্যাগে,
মহান স্বাধীনতা বিজয়ে
প্রিয় মাতৃভাষা, মাতৃভূমিকে
পেয়েছি একান্ত সত্তাতে।

ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়ে

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

স্বাধীনতার সূর্য হাসে
নীল আকাশের গায়
একাত্তরে দেশের জন্য
সবাই যুদ্ধে যায়।
এক নদী রক্ত ঢেলে
বিজয় ঘরে আসে
বাঙালিরা বিজয় এনে
খুশির জোয়ারে ভাসে।
অস্ত্র হাতে লড়াই করে
মাতৃভূমির টানে
বাঙালিরা বীরের জাতি
পরাজয় না মানে।
লাল-সবুজের পতাকাটা
উড়ছে পতপত
স্বাধীনতা পেয়ে বাঙালির
পুরছে মনোরথ।
আজ বাঙালি স্বাধীন জাতি
বিশ্বের সবাই জানে
ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়ে
স্বাধীনতা আনে।

মুজিব আছে

আহসানুল হক

মুজিব আছে রাষ্ট্রভাষায়
বুকের পাতায় পাতায়
মুজিব আছে ভালোবাসায়
খুকুর ছবির খাতায়!
মুজিব আছে ওই পতাকায়
মুজিব স্বাধীনতায়
মুজিব আছে বাউরি হাওয়ায়
মায়ের নকশিকাঁথায়!
মুজিব আছে বটের ছায়ায়
উদাস বাউল গানে
মুজিব আছে স্বদেশ মায়ায়
নদীর কলতানে!
মুজিব আছে পরম পাওয়ায়
দোয়েল-শ্যামার শিসে
'হারান' মাঝির বৈঠা বাওয়ায়
লাল-সবুজে মিশে!

মুজিব চিরঞ্জীব

সাঈদ তপু

যে আকাশ তোমার খুব প্রিয়
যে মাটির পরানে তোমার পরান
যে মাটিকে ভালোবেসে
ঘাম দিলে, শ্রম দিলে
জীবনের সাধ-আহ্লাদ সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে
শুধু রক্তটুকু ছিল বাকি
শেষমেষ তাও দিলে
মাটির উর্বরতা বাড়াতে
বাংলার মাটি তুমি করলে চির আলিঙ্গন
ওটা মৃত্যু নয়–জন্মের আরেক অধ্যায়
ঘাতকেরা জানে না
কারো কারো জন্য জন্ম হয়, মৃত্যু হয় না
ঘাতকের কাগজে মোড়ানো জীবন সবার নয়
যে জীবন নদীর প্রবাহ হয়ে
মিশে থাকে জীবনের স্রোতে
যাঁর পাতায় পাতায় সোনালি ঈগল
পাখা মেলে খুঁজে আনে
নতুন জীবনের দিক
সে তো অক্ষয়, বহ্নি
যে থাকে গোপন বারুদে
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের শলাকায়
শুধু শতবর্ষ নয়
শত সহস্রাব্দ পরেও
আরো আড়ম্বরপূর্ণভাবে
পালন হবে তোমার জন্মদিন
তোমার মৃত্যুদিন কখনো আসবে না
যদি কোনোদিন বিবর্তনের ধারায়
কিংবা বৈরী আবহাওয়ায়
সভ্যতার সুতো ছিঁড়ে যায়
ফিরে আসে নুহযুগ-মহাপ্লাবন
নিভে যায় ধরণীর দীপ
সেদিনও বাংলার আকাশে লেখা থাকবে
মুজিব চিরঞ্জীব।

বাঙালির হৃদয়জুড়ে

সুস্মিতা বিনতে আলম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তুমি আছো–
বাংলার ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তরে
বৃষকের লাঙন ফসলের মাঠে
কলকারখানায় শ্রমিকের সিক্ত ঘামে
দিনমজুরির খেটে খাওয়া দিনগুলোতে
মায়ের আঁচলে পরম স্নেহে
বাবার আদর মমতামাখা চুমুতে
ভাইয়ের রক্তাক্ত রণাঙ্গনের মিছিলে
বোনের অধিকার আদায়ের সারিতে
শিশুর আধো আধো বোলে
কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়জুড়ে।

সংগ্রাম

এস এম তিতুমীর

এই শহর সেদিন জানলো,
অকস্মাৎ আকাশ ভেঙে পড়ার মানে।
অলিতে-গলিতে মাথা বাঁচানোর নামে
কথা বলল, চিকা মারা দেয়াল
আক্রান্ত হলো সবাই–
তারপর,
প্রণয়ের যুগল যারা,তাদের বাহুডোরে
লাগলো আগুন। পুড়ে গেল প্রেমান্ধ মুকুল–
আগুন জন্ম দেওয়া প্রসূতির চোখে।
নিশ্চুপ,
রক্ষা পাবার সব আয়োজন। উত্তেজনায় উত্তাল শহর
গ্রামের পলি। প্রিয়াহীন বাহুডোর মেশিনগানে ভরা
যুদ্ধ দামামায় ভরা রাজপথ। যুদ্ধ, প্রাণপণ যুদ্ধ
সরব,
রক্ষা করার চেতনা। রক্তাক্ত প্রেমিকের আর্তনাদ
তোমাতেই সমর্পিত আমি, জন্ম জন্মান্তরে
মার্চের পরে, বলীয়ান মার্চ আমি। আগুনে ভরা
জাতির অক্ষত অনুক্রম
প্রসবিত,
সংগ্রাম যুগে যুগে। মৃত্তিকার লড়াইয়ে আমরণ
সূর্য সমান আমাদের ধাত্রী সম্ভ্রম।

উত্থিত শির

অমিত কুমার কুণ্ডু

নবীন তরুণ থাকে পুরানোর ভিড়ে
তাইতো নতুন আসে বারে বারে ফিরে
তাইতো দু'হাতে তুলি মুঠোভরা আশা
তাইতো বুকের মাঝে এত ভালোবাসা।
নতুন পাঠাবে দূরে জরাব্যাধি ভুল
নতুন ফোটাবে বুকে সুকোমল ফুল
নতুন রাখবে ধরে সাহসের টিপ
নতুন জ্বালবে হেসে জ্ঞানের প্রদীপ।
নতুন বছর আসে এ নতুন নিয়ে
শোক-তাপ দূরে রেখে ভালোবাসা দিয়ে
সমগ্র পৃথিবীরই শুভ আহ্বানে
আলোর মশাল হাতে হাসি-নাচ-গানে।
এমন সময় এস হাতে রাখি হাত
কালো রাত কেটে গিয়ে আসুক প্রভাত
মৈত্রীর বন্ধনে ভুলি মিছে ভয়
সত্য প্রকাশে হোক সাহসের জয়।
মন প্রাণ দিয়ে বলি মুজিবের নাম
জয় বাংলার জয় বলি অবিরাম
বাংলার পিতা তিনি ধীরস্থির
হিমালয় সম যার উত্থিত শির।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে ২রা মার্চ ২০২১ বঙ্গভবনে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৭-২০১৮ পেশ করেন–পিআইডি

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি 'একুশে পদক ২০২১' প্রদান উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনসহ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভাষাশহিদদের গৌরবদীপ্ত আত্মত্যাগের স্মৃতিবাহী দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্নক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রতিবছর একুশে পদক প্রদান করে আসছে। সম্মাননাপ্রাপ্ত গুণীজনরা জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান। তাঁদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মননচর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরিসংখ্যানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরিসংখ্যানই কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপে পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আয়োজিত দেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস' পালন উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিটি সেক্টরে নির্ভুল ও সময়ানুগ পরিসংখ্যানের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস'-এর প্রতিপাদ্য– 'নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, টেকসই উন্নয়নের উপাদান' (Reliable statistics part of Sustainable Development) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে বিবিএস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নে 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' ও এ সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সর্বক্ষেত্রে দাপ্তরিক পরিসংখ্যান হিসেবে বিবিএস-এর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের বাধ্যবাধকতায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জনগণের নিরাপত্তায় বিমানবাহিনীকে কাজ করার নির্দেশ রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ দেশের সেবা এবং জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর (বিএএফ) সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন। সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মনে রাখবেন আপনারা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য হলেও এদেশেরই সন্তান। দেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আপনারাও দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সমান অংশীদার। পেশাদারিত্বের নিপুণতা বজায় রাখার পাশাপাশি জনগণের প্রয়োজনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বরিশাল রাডার ইউনিট এবং হেলিকপ্টার সিমুলেটর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রপতির পক্ষে ফলক উন্মোচন করেন বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত।

বরিশালে রাডার ইউনিটের গুরুত্ব তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান, বিশাল সমুদ্রসীমার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তা বিধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা দ্রুত ও সহজতর করতে এবং এই অঞ্চলের আকাশসীমায় পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা বাড়াতে বরিশালের ইউনিট স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া সিমুলেটর ইনস্টিটিউট প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, নবনির্মিত হেলিকপ্টার সিমুলেটর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আমাদের বৈমানিকদের উড্ডয়নের একটি অংশে সিমুলেটরের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। ফলে প্রশিক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দ্বৈত ভাষায় প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ 'মুক্তির ডাক'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস- এর মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্জনে প্রকাশিত ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি সম্ভাবনা ধরে রাখতে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, গবেষণা বাড়ানো গেলে কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারজাত করা সহজ হবে। তিনি গবেষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। দেশের কৃষিপণ্য খাতকে মানসম্পন্ন করা যায় সেজন্য অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগার তৈরি করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বিবেচনা করে যে ফসল যেখানে ভালো উৎপন্ন হয় সেখানেই তার চাষাবাদ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নারায়নগঞ্জে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সেন্টারটা যখন তৈরি হবে তখন এদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগ মানুষ আরো ভালোভাবে পাবে। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষ করে ক্যান্সারের ওপর আরো গবেষণায় গুরত্বারোপ এবং দেশের পরিবেশ এবং জলবায়ুর সঙ্গে ক্যান্সার কীভাবে বিস্তার লাভ করে সেজন্য গবেষণা দরকার বলে উল্লেখ করেন। দেশের সব বিভাগে

অন্তত একটি করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হলে সেখানে রিসার্চের সুযোগ হবে এবং তা স্থাপন করা সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০ হাজার টাকা করার ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনসহ দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা প্রান্তে যুক্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি খুবই আনন্দিত। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা এখন আর কারো হাত থেকে নিতে হবে না, এটা সরাসরি তাদের হাতে যেন পৌঁছে যায়।' এছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা যাতে আরো সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারেন সেজন্য তাদের সম্মানী ভাতা ২০ হাজার টাকা করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী।

খাদ্যে ভেজাল রোধে সচেতন হওয়ার আহ্বান

'টেকসই উন্নয়ন সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয়–নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে খাদ্য মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী খাদ্যে ভেজাল রোধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান এবং অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রম। এছাড়া কেন্দ্রীয় ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরির পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়েও পরীক্ষাগার হবে বলে আশ্বাস দেন।

একুশে পদক প্রদান

জাতীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে একুশে পদক ২০২১ তুলে দেওয়া হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন 'একুশে পদক ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। তাঁর পক্ষে পুরস্কার প্রদান করেন মন্ত্রিপরিষদের সিনিয়র সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক, সনদপত্র এবং নগদ অর্থের চেক প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৭ই মার্চ ২০২১ জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: বাঙালির মুক্তির সড়ক' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান চিরভাস্বর

বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে চিরভাস্বর বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উপস্থাপন করেছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভোরে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনকালে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, অমর শহিদদের রক্তে রঞ্জিত ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উপস্থাপন করেছিলেন।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে যাতে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। অমর একুশের প্রাক্কালে ভাষার মাসের কয়েকটি সভায় তথ্যমন্ত্রী ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলেন, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেবার পর বঙ্গবন্ধুই এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন ও পরে এই আন্দোলনের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয় এবং সেখানেও তিনি অনশনের মাধ্যমে ভাষার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। মহান ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অনবদ্য অবদানকে ঠিকভাবে তুলে ধরতে ইতিহাসের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ।

গণমাধ্যমের অগ্রযাত্রা স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতায়

গণমাধ্যমের অগ্রযাত্রায় স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর তোপখানা রোডে প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। প্রেস কাউন্সিল প্যানেল চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান ও তথ্যসচিব খাজা মিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যম যাতে সমাজের দর্পণ হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, ভুল এবং অসত্য সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকে এবং সেটি হলে যাতে প্রতিকার হয়, সেলক্ষ্য নিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। প্রেস কাউন্সিল তখন থেকেই অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

দুটি বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদান

১লা ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনে গৃহীত দুটি বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১ পাস

জাতীয় সংসদে ১লা ফেব্রুয়ারি 'শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১' পাস হয়।

বিশ্ব এনটিডি দিবস পালিত

নেগলেক্টেড ট্রপিকাল ডিজিজগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে সারা দেশব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব এনডিটি দিবস ।

একনেকে ৮টি প্রকল্প অনুমোদন

৩রা ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক এর সভায় ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

একুশে পদক ২০২১ ঘোষণা

৪ঠা ফেব্রুয়ারি : সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে ২০২১ সালের একুশে পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

৫ই ফেব্রুয়ারি : প্রতিবছরের ন্যায় এবারো সারা দেশে পালিত হয় 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস'।

কলকাতায় জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌বোধন

তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাৎসরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রসনদের নন্দন-১ হলে ৫-১১ই ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজিত 'আর্ন্তজাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১'-এর সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে জানুয়ারি থেকে সাত দিনব্যাপী আয়োজিত উৎসব উপলক্ষে ৩টি ভেন্যু থেকে ৩৭টি দেশের ১৯৭টি শিশু চলচ্চিত্র প্রর্দশন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ ২০২১ গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ স্মরণে ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট ও উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন–পিআইডি

কৃষিবিদ দিবস পালিত

১৩ই ফেব্রুয়ারি: সারা দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'কৃষিবিদ দিবস ২০২১'।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস ।

বিশ্ব বেতার দিবস পালিত

নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় এবারের 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২১'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নতুন বিশ্ব, নতুন বেতার'।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১ উদ্‌যাপিত

১৮ই ফেব্রুয়ারি: খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চতুর্থবারের মতো উদ্‌যাপিত হয় 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'টেকসই উন্নয়ন-সমৃদ্ধ দেশ, নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ'।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বিইউপিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

অনলাইনে দুদিনব্যাপী ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২৮শে ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত কর্মকর্তা এবং নীতি নির্ধারকদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে সঙ্গে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কিং সহযোগিতা তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– 'শেইপিং এ সাসটেইনেবল ফিউচার থ্রু অ্যাডভান্সমেন্ট ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি।'

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বাংলাদেশ

মিয়ানমারে নির্বাচিত অং সান সুচি সরকারের পতন ঘনিয়ে ১লা ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান হয় সেনাশাসনের। এদিন সুচিকেসহ মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উনি মিন্ট ও ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে আটক করা হয়েছে। সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে জারি করা হয়েছে এক বছরের জরুরি অবস্থা। এদিনই মিয়ানমারের নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল। এর কয়েক ঘন্টা আগেই ঘটে এই সেনা অভ্যুত্থান।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সামরিক শাসন চলা মিয়ানমার ২০১৫ সালের নির্বাচনের মাধ্যম গণতান্ত্রিক শাসন শুরু করে। গত নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের সুচির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আবারো জয় পায়। নির্বাচনের পর থেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ করে আসছিল সেনাবাহিনী ও সেনা সমর্থিত দল ইউনিয়ন সলিজারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্ট। ২৮শে জানুয়ারি দেশটির নির্বাচন কমিশন এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। এর চার দিনের মাথায় ঘটে সেনা অভ্যুত্থান।

মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের আলোচনা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের বিষয়ে বাংলাদেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান যেমন জরুরি তেমনি আবার গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতিও বাংলাদেশ শ্রদ্ধাশীল।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

৫ই মার্চ ২০২১ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন নতুন সংযোজিত ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ 'শ্বেতবলাকা' ঢাকায় পৌঁছেছে–পিআইডি

বাংলাদেশে প্রথম সিমুলেটর কমপ্লেক্স

বিশ্ববাজারে মানসম্পন্ন নাবিক তৈরি করতে দেশে প্রথমবারের মতো সিমুলেটর কমপ্লেক্স হচ্ছে মেরিটাইম ইনস্টিটিউট। ৪০ কোটি টাকার প্রকল্পটির অর্ধেক কাজ শেষ। জুনের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করার আশা কর্তৃপক্ষের। জাহাজ পরিচালনায় ক্যাডেট তৈরিতে দেশে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, তা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ছিল না। কিছু থাকলেও তা সমন্বিত ছিল না। ফলে ক্যাডেটরা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সেভাবে সক্ষমতা দেখাতে পারছিলেন না। এই অসুবিধা দূর করতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্যাডেট তৈরিতে দেশে প্রথম 'সিমুলেটর কমপ্লেক্স' স্থাপন করছে চট্টগ্রামের সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (এনএমআই)। মেরিটাইম সেক্টরের দক্ষ জনবল তৈরির অংশ হিসেবে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় এটি স্থাপন করছে। জাহাজের সিমুলেটর ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় মনে হবে যেন সত্যিকারেই কোনো জাহাজ চালাচ্ছেন। সিমুলেটরে থাকবে পুরোপুরি জাহাজের আবহ, পাওয়া যাবে ইঞ্জিনের শব্দ। বাদ পড়বে না পরিবেশ ও ঢেউয়ের শব্দ থেকে শুরু করে উত্তাল সাগরে জাহাজের ছুটে চলা, ঝড়ের মুখে পড়া, এমনকি ঝড় সামলে এগিয়ে চলার সব শেখা যাবে সত্যিকারের জাহাজের আদলেই। যা বাংলাদেশে প্রথম ও একেবারে নতুন।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি বা ইউএন-সিডিপির চেয়ার টেফারি টেসফাসো ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শুক্রবার-রাতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে সিডিপির পাঁচ দিনব্যাপী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভা শেষে এই ঘোষণা আসে।

জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো দেশ পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পায়। বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো মানদণ্ডগুলো অর্জন করেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে থাকা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সিডিপির সব শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। সিডিপি তিনটি সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ শর্ত পূরণ করে অনেক এগিয়ে গেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে পাঁচ বছর পর এলডিসি থেকে বের হয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের কাতারে চলে যাবে বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল দেশ হতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় দরকার কমপক্ষে ১২২২ মার্কিন ডলার। ২০২০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ২০৬৪ মার্কিন ডলার।

মানবসম্পদ সূচকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে ৬৬ পয়েন্টের প্রয়োজন; বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৭৫.৪। সাধারণত সিডিপির চূড়ান্ত সুপারিশের তিন বছর পর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্মার্টফোন চুরি প্রতিরোধে 'থিফগার্ড' অ্যাপ

যুগান্তকারী অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ 'থিফগার্ড' চালু করল সফটালজি লিমিটেড নামের দেশীয় একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। স্মার্টফোন চোরের হাত থেকে সুরক্ষায় এই অ্যাপ চালু করা হয়। হারিয়ে যাওয়া ডিভাইস শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে অ্যাপটি। ১৮ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাপটি চালু হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, মোবাইল ফোন চুরি হলে চোরের ছবি ও লোকেশন জানতে সহায়তা করবে অ্যাপটি। এ সময় চোর মোবাইল ফোন বন্ধ করতে পারবে না। চোর মোবাইল ফোনটি কম্পিউটারের সাথে কানেক্টও করতে পারবে না। মোবাইলের সিম চেঞ্জ করলে মালিককে নতুন সিম নাম্বার জানিয়ে দিবে। অনুমতি ছাড়া কেউই ডিভাইসে থাকা কোনো ডাটাতে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। মোবাইল ফোন চুরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে যে-কোনো স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার থেকে www.thiefguardbd.com ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। লগইন করলেই চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনের ক্যামেরা চালু করা যাবে এবং চুরি হওয়া

তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২১ রাজধানীর বাংলামোটরে আইসিটি ক্লাবের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

মোবাইল থেকে মোবাইলের মালিকের ই-মেইলে ছবি পাঠাতে থাকবে। এ সময় জিপিএস অন করে দিলে লোকেশনও পাঠাতে থাকবে। এই অ্যাপের অন্যান্য ফিচারগুলো হলো- মোবাইল ফোনের মালিক চাইলে হারিয়ে যাওয়া ফোনের স্ক্রিন লক করতে পারবেন, ভাইরাস স্ক্যান করতে পারবেন। আবার পাবলিক প্লেসে গোপনে কেউ মোবাইল বের করতে চাইলে সাইরেন বেজে উঠবে।

'থিফগার্ড' অ্যাপটি ইনস্টল করা থাকলে নির্ভয়ে ফোন ব্যবহার করা যাবে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, ফোন নাম্বার ও প্রিয় মোবাইল ফোনটি সুরক্ষিত থাকবে। এই অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড-৭ থেকে যে-কোনো ভার্সনে ব্যবহার করা যাবে। ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদি 'Thief Guard' অ্যাপটির মূল্য যথাক্রমে ৩৫০ টাকা ও ৫৯০ টাকা।

ধ্বনি ও বাংলা ডট গভ ডট বিডির উদ্‌বোধন

বাংলা থেকে আইপিএতে রূপান্তরের সফটওয়্যার ধ্বনি এবং বাংলা ডট গভ ডট বিডি ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এগুলোর উদ্‌বোধন করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প। এর উদ্দেশ গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রিয়েল টাইম অটোমেটিক স্পিচ টু স্পিচ ম্যাশিন ট্রান্সলেশনসহ বিভিন্ন রিসোর্সের প্রয়োজন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ভাষা প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেকগুলো সার্ভিস ও রিসোর্স তৈরি হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে ২০টি পাবলিক ফেসিং সার্ভিস, ১৬টি রিসার্চ টুলস ও রিসোর্স, ৮ ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ও প্রিন্টেড রিসোর্স এবং ১০ ধরনের করপাস বা ডেটাসেট উল্লেখযোগ্য। এর মাধ্যমে পৃথিবীর সব বাংলা ভাষাভাষী যেমন এর প্রত্যক্ষ উপকার পাবে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সদস্য ও বাক-দৃষ্টি শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগাষ্ঠী এর মাধ্যমে সুফল পাবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ডট গভ ডট বিডির ওয়েবসাইট ও ধ্বনি সফটওয়্যারটির 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' প্রকাশ করছি। বাংলা ডট গভ ডট বিডি ভাষা প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির প্ল্যাটফর্ম। প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন করা বাংলা ভাষার বিভিন্ন সার্ভিস পাওয়া যাবে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি হচ্ছে কৃষিপণ্য

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো বাঁধাকপি উৎপাদনে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক আগে থেকেই এগিয়ে আছে। প্রতিবছর ভরা মৌসুমে ন্যায্যমূল্য না পেয়ে হতাশ হতেন কৃষকরা। কখনো কখনো চাষের খরচও তুলতে পারতেন না তারা; কিন্তু সেই দিন বদলাতে শুরু করেছে। বগুড়ার বাঁধাকপি এখন রপ্তানি হচ্ছে ছয়টি দেশে। এ রপ্তানিতে ভূমিকা রাখছে দেশের শীর্ষস্থানীয় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারক মাসওয়া অ্যাগ্রো লিমিটেড। এছাড়া আলু, মিষ্টিকুমড়াও রপ্তানি করছে এ প্রতিষ্ঠান। ন্যায্য দাম পেয়ে আবাদি চাষিরা আরো উৎসাহী হচ্ছেন।

উৎপাদনশীলতা পুরস্কার পাচ্ছে ৩১টি প্রতিষ্ঠান

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য তৈরিতে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

২০১৯ সালের জন্য বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প শ্রেণিতে দেওয়া হবে এই পুরস্কার। পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ দুটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট।

শিল্প মন্ত্রণালয় চলতি মাসেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই পুরস্কার দিতে চায়। পুরস্কারের জন্য মনোনীত ৩১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপেরই ১০টি প্রতিষ্ঠান।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

জামা-জুতার টাকা পাবে শিক্ষার্থীরা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার পর জামা-জুতা ও ব্যাগ কেনার জন্য ১ হাজার করে টাকা পাবে শিক্ষার্থীরা। কিট অ্যালাউন্স হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এ টাকা দেওয়া হবে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'নগদ'-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান। ডাক বিভাগের মোবাইল ফোন ভিত্তিক ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ ভাতা বিতরণ শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মার্চ ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদান প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সরকারি প্রাথমিকে চালু করা হবে ইংরেজি ভার্সন

দেশের প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভার্সন চালুর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। ৩১শে জানুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের 'ইংরেজি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনারদের' প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে একথা বলেন। প্রথমে এ প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে হেব পরীক্ষামূলক এবং রাজধানীতে শুরু করা হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালযে দুজন করে আলাদা ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এটি চালু হলে প্রাথমিক বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনেও পড়ার সুযোগ পাবে শিক্ষার্থীরা। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ১ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে ৯টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ইংরেজির বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে আরো ১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষককে ইংরেজি ভাষার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

দক্ষ জনশক্তি গড়তে বহুমাত্রিক শিক্ষা চালুর আশ্বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিক্ষাকে বহুমাত্রিক করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং শিক্ষা সহায়তায় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শিক্ষা সহায়তায় সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এসময় ১ লাখ ৬৩ হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্নাতক পর্যায়ে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৮৮২ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭ কোটি ৪৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪০০ টাকা ও ভর্তি সহায়তা বাবদ ৪ জন শিক্ষার্থীকে ২ লাখ টাকাসহ মোট ৮৭ কোটি ৫২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বিতরণের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

পুঁজিবাজারে গতিশীলতা আনতে গ্রিনফিল্ড প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে হবে

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, পুঁজিবাজারে গতিশীলতা আনতে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের 'গ্রিনফিল্ড প্রকল্প' (সম্পূর্ণ নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থাপিত শিল্প বা প্রকল্প) গ্রহণে উৎসাহ দিয়ে পুঁজিবাজারে আসার আহ্বান জানাতে হবে। এতে পুঁজিবাজারের ওপর বিনিয়োগকারীগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে ও সার্বিকভাবে 'উইন-উইন সিচুয়েশন' তৈরি হবে। ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সম্ভাবনা উপস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) আয়োজনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে এক হোটেলে 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার: পটেনশিয়ালস অব বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট' শীর্ষক চারদিনব্যাপী এক রোডশো-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী এ কথা বলেন। এসময় দুবাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মো. ইকবাল হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

রোডশো-এর প্রথমদিন প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আবেদন সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃথক দুটি পর্বে 'বাংলাদেশের পুঁজিবাজার' শীর্ষক বিনিয়োগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রোডশো-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য যথাক্রমে 'সুকুক (ইসলামি বন্ড): বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ' ও 'বাংলাদেশে বেসরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি খাতে বিনিয়োগের সুযোগ' শীর্ষক বিনিয়োগ সম্মেলন হয়। রোডশো-এর প্রথমদিনের সম্মেলনে অনলাইন বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) অ্যাকাউন্ট খোলার পোর্টাল উদ্‌বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ অনলাইনে তাদের অ্যাকাউন্ট খুলতে সক্ষম হবেন। এই রোডশো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের উপস্থিতিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লি.-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–পিআইডি

প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৌদি বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে আগ্রহী

বাংলাদেশের পর্যটন খাতে সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এসসা ইউসেফ এসসা আল দুলাইহানের সাক্ষাৎকালে সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করলে তার জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। সাক্ষাৎকালে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বলেন, সৌদি বিনিয়োগকারীদের সাথে বাংলাদেশের পর্যটন উন্নয়নে একত্রে কাজ করাটা হবে আনন্দের। একই সাথে এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়নেও একত্রে কাজ করতে পারবেন বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তিনি। কোভিড-১৯ মহামারির এই সময়ে সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের দিকে খেয়াল রাখায় সৌদি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ২০ হাজারে উন্নীত ভাতা পাবেন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০ হাজার টাকা করা হচ্ছে এবং এটি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সবার কাছে পৌঁছে যাবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় আয়োজিত রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা অনেকের ঘরবাড়ি নেই। তাদের ঘরবাড়ি করে দিচ্ছি। যাদের ত্যাগে দেশ পেলাম, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ি থাকবে না, আমি ক্ষমতায় থাকতে এটা হতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষা করে খাবে, ঘর থাকবে না, তাদের ছেলেমেয়েরা অবহেলিত হবে, এটি আমি মানতে পারি না। কারণ তাদের অবদানেই তো আমাদের আজকের স্বাধীনতা। আজকে আমরা যে যা কিছু হচ্ছি, যত সম্পদ যে যা কামাচ্ছি, সবই তো তাদের অবদানের জন্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের এখন আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, কারও কাছে ধরনা দিতে হবে না। সরকার থেকে জনগণ, অর্থাৎ জি টু পির মাধ্যমে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২১ বছর পর আমরা ক্ষমতায় এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেওয়ার উদ্যোগ নিই। তাদের সম্মানী ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি। তাঁদের সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সন্তানদের চাকরি নিশ্চিত করেছি। এখন ভাতা যাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহজে পান সে ব্যবস্থাও নিয়েছি। আজকে এটির উদ্‌বোধন হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ১২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, এই সময় ১২ হাজার টাকা কিছুই নয়। একে আমরা ২০ হাজার টাকা করে দেব। এটা করতে একটু সময় নেব। কারণ, বাজেটে টাকা বরাদ্দসহ সবকিছুর ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে। তবে এটা আমরা করে দেব।

বিত্তবানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন না করলে বিত্তশালী হতে পারতেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের ভালো রাখার জন্য অন্তত আপনারা তাদের পাশে দাঁড়ান। আমিও সরকারিভাবে আমার করণীয় যেটা করছি, করব।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

নারীর নিরাপত্তায় সদা প্রস্তুত পুলিশের কিউআরটি

অত্যাচার, নির্যাতন থেকে শুরু করে পথে-ঘাটে যে-কোনো অপ্রীতিকর ঘটনায় নারী নিজেকে অনিরাপদ মনে করলেই বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়াতে সদা প্রস্তুত আছে পুলিশের কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) দিন-রাত যে-কোনো সময় এ দলকে পাশে পেতে ফোন করতে হবে ০১৩২০০৪২০৫৫ নম্বরে (হটলাইন)।

কিউআরটি'র সদস্যরা ১২ ঘণ্টা করে দলে ভাগ হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সাব ইন্সপেক্টর প্রতিটি দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুজন গাড়িচালকও প্রস্তুত থাকেন।

উদ্ধারজনিত কোনো ফোন পেলেই তারা ছুটে যাচ্ছেন। ২৮ জনবলের কিউআরটি পূর্ণাঙ্গ একটি দল হিসেবে কাজ করছে। ডিএমপির অধীনে কোনো স্থানে ঘটনা ঘটলে উদ্ধার পাওয়া যাবে এবং সারাদেশের সবাই আইনি পরামর্শ পাবেন এখান থেকে। কিউআরটিতে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের পাশাপাশি আক্রান্ত বা ভিকটিমকে দ্রুত উদ্ধারসহ অন্যান্য সহায়তা দিতে কিউআরটি যাত্রা শুরু করে গত বছরের ২৭শে অক্টোবর থেকে।

ভাষা গবেষণায় পুরস্কার পেল সাজিয়া

'কননিটিভ চ্যালেঞ্জেস অব অ্যানাফোরা: আ স্টাডি অন বাংলা প্রনোমিনাল এক্সপ্রেশন' নামক থিসিসের জন্য সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাজিয়া মেহনাজ পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিওন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'আউটস্ট্যান্ডিং করপাস থিসিস অ্যাওয়ার্ড' ডাক্তারদের কাছে আসা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ই মার্চ ২০২১ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'জয়িতা পদক ২০২১' প্রাপ্তদের সঙ্গে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন–পিআইডি

রোগীদের রোগের উপসর্গ নিয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা যেমন: শরীর ম্যাজম্যাজ, চিনচিন, টনটন করছে– এ রকম ভাষাগুলো কম্পিউটারে দেওয়া মাত্রই কম্পিউটার যদি বের করে ফেলে ফোন ধরনের অসুখে মানুষ কোন শব্দগুলো বেশি ব্যবহার করে, নিশ্চয়ই সেটি ডাক্তারের খুব কাজে আসবে। এ চিন্তা থেকেই ২০২০ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ থিসিসটি জমা দিয়েছিলেন সাজিয়া।

সাজিয়া 'কর্পাস' আর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং'-এ দুই বিষয়কে এক করে গবেষণাটি করেছেন। বর্তমানে সাজিয়া একটি বেসরকারি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েট লিঙ্গুয়িস্ট হিসেবে কর্মরত।

সৌদি নারীরা এখন সামরিক বাহিনীতে

সৌদি নারীরা এবার অস্ত্র হাতে নিতে পারবে এবং যোগ দিতে পারবে সেনাবাহিনীতে। সম্প্রতি দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নারীদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। সৌদি নেতা যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০' নামক সংস্কার কর্মসূচির আওতায় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ খবরটি নিশ্চিত করেছে। সৌদি নারীরা এখন থেকে দেশের সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় সিপাহি থেকে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে সামরিক কাজ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

হাইজিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত অবমুক্ত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত হাইজিংক সমৃদ্ধ 'ব্রি ধান-১০০' জাত অবমুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো. মেসবাহুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু দেশি পাটের (বিজেআরআই দেশি পাট-১০) জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ব্রি উদ্ভাবিত শততম জাতের (ব্রি ধান-১০০) অবমুক্তকরণ এটি।

ব্রি'র তথ্যে জানা যায়, 'ব্রি ধান-১০০' হাইজিংক সমৃদ্ধ। জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫.৭০ মিলিগ্রাম। দেশের ১০টি স্থানে ট্রায়াল করে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৬৯ মেট্রিক টন পাওয়া গেছে। জাতটির জীবনকাল ১৪৮ দিন। এটি বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেন, মুজিব শতবর্ষে উচ্চ জিংক সমৃদ্ধ 'ব্রি ধান-১০০' অবমুক্ত করতে পারা খুবই আনন্দের। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। জিংক সমৃদ্ধ এ জাতটি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জিংকের চাহিদা অনেকটাই পূরণ হবে।

পণ্য আমদানি-রপ্তানির সনদ মিলবে অনলাইনে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইং-এর অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। এর ফলে এখন থেকে কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির সনদ মিলবে অনলাইনে। কৃষিমন্ত্রী ১৬ই ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এই অটোমেশনের ফলে সেবা গ্রহীতারা দ্রুত সহজে সেবা পাবেন। সনদ গ্রহণে ভোগান্তি কমবে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটি ছিল অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আইসিটির সুযোগ-সুবিধা আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম অনেক বেশি দ্রুত গতিসম্পন্ন, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতি মুক্ত হয়েছে।

চাষের নতুন পদ্ধতি 'সমলয়'

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষেতগুলো ছোটো ছোটো। এছাড়া কৃষকেরা বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন সময়ে চারা রোপণ করে। ফলে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার সঠিকভাবে করা যায় না। 'সমলয়' পদ্ধতিতে চাষ করলে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর হবে। কৃষকের সময় ও শ্রম খরচ কমবে এবং কৃষক লাভবান হবে। কৃষিমন্ত্রী ২০শে ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে কেন্দুয়া গ্রামে 'সমলয়' পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ৫০ একর জমিতে/ব্লকে ধানের চারা রোপণ উদ্‌বোধন ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে ১ ঘণ্টায় ধানের চারা রোপণ করা যায়। এর ফলে একর প্রতি কৃষকের খরচ কমবে ৪৫০০ টাকা।

'সমলয়' চাষের এক নতুন পদ্ধতি। সবাই মিলে একটি ব্লকে/মাঠে একইসঙ্গে একই জাতের ধান একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে রোপণ করা হয়। বীজতলা থেকে কর্তন, সকল প্রক্রিয়া যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে সম্পাদন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ধান আবাদ করতে হলে চারা তৈরি করতে হয় ট্রেতে। ট্রেতে চারা উৎপাদনে জমির অপচয় কম হয়। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা একই গভীরতায় সমানভাবে লাগানো যায়। কৃষক তার ফসল একত্রে মাঠ থেকে ঘরে তুলতে পারে। কারণ একইসঙ্গে রোপণ করায় সব ধান পাকবেও একই সময়ে। তখন ধান কাটার মেশিন দিয়ে একইসঙ্গে সব ধান কর্তন ও মাড়াই করা যাবে। এসব কারণে সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর ও বৃদ্ধি হবে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইংয়ের অটোমেশন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় যাচ্ছে দেশ

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আধুনিক বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও গড়ে উঠবে উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হবে। আগামীতে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বড়ো বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। নিজ বাসভবনে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা গ্রিড এলাকার শতভাগ উপজেলায়, পৌরসভায় এবং গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ করেছি। এখন অফগ্রিড এলাকায় কাজ চলছে। যেমন দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের কিছু জায়গা, চর এলাকা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়ার মতো দ্বীপ অঞ্চল, ব্রহ্মপুত্র নদে অনেকগুলো চর জেগেছে– এসব জায়গায় সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিচ্ছি। এ এলাকাগুলোতে এখন বিদ্যুতের যে চাহিদা আছে তা ভবিষ্যতে তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে। এজন্য এসব জায়গায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ লাগবে। আর নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে সম্ভব নয়। দক্ষিণাঞ্চলের সব দ্বীপে বিদ্যুতায়ন হয়ে যাবে এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। এ কাজ জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিদেশ থেকে সাবমেরিন ক্যাবল আনতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সেক্ষেত্রে দ্বীপ অঞ্চলগুলোতে এ বছরের মধ্যে বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষেই তাদের জন্য শতভাগ বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৬ হাজার ৭২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ছয় হাজার ৭২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি আরও জানান, গত ১০ বছরে এই বিনিয়োগের কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।। জানান, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫৭ শতাংশ আবাসিক খাতে, ১০ শতাংশ বাণিজ্যিক খাতে এবং ২৮ শতাংশ শিল্প খাতে ব্যবহৃত হয়েছে। নসরুল হামিদ জানান, বৈশ্বিক মহামারির কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা কিছুটা কম ছিল। ফলে মেরিট অর্ডার ডেসপাস অনুযায়ী কিছু কিছু তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। এছাড়া গ্যাসের স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আংশিক চালু রয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২০-এর জন্য ৬ ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠান মনোনীত

দেশের পরিবেশ উন্নয়নে আসামান্য এবং অনুসরণীয় অবদান রাখার জন্য জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২০ প্রদানের জন্য ৩ জন ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২০ মনোনয়ন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত পদক সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ক্যাটাগরির ব্যক্তিগত পর্যায়ে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), সভার প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি অ্যান টেইলর এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কনকর্ড রেডিমিক্স অ্যান্ড কনক্রিট প্রোডাক্টস লিমিটেড ও কনকর্ড প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট অ্যান্ড ব্লক প্ল্যান্ট লিমিটেড কনকর্ড সেন্টারকে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার ক্যাটাগরির ব্যক্তিগত পর্যায়ে খ্যাতিমান জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ ড. সালীমুল হক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)কে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটাগরির ব্যক্তিগত পর্যায়ে ড. জহুরুল করিম এবং প্রাতিষ্ঠনিক পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে হাই কোর্টের তিন নির্দেশনা

রাজধানীর বায়ুদূষণ রোধে তিনটি নির্দেশনা দিয়েছে হাই কোর্ট। এক রিট আবেদনে যুক্ত হওয়া সম্পূরক আবেদনের শুনানি নিয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। তিন নির্দেশনা হলো- এক. ঢাকা শহরের প্রবেশমুখ-গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, পূর্বাচল, কেরানীগঞ্জ, টঙ্গীসহ বিভিন্ন পয়েন্টে পানি ছিটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই. ঢাকা শহরের রাস্তায় ওপর থেকে পানি ছিটাতে হবে, যেন রাস্তার পাশের ছোটোখাটো গাছে জমে থাকা ধুলা-ময়লা পরিষ্কার হয়। ঢাকা সিটি করপোরেশনকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন. শহরে পানি ছিটানোর ক্ষেত্রে পানির ঘাটতি তৈরি হলে সিটি করপোরেশনকে পানি সরবরাহ করতে হবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বায়তুল আজগর সাত গম্বুজ মসজিদ

বায়তুল আজগর সাত গম্বুজ মসজিদটি ইতিহাস ও ঐহিহ্যের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। কুমিল্লার

দেবিদ্বার উপজেলার এ মসজিদটিতে কারুকাজ করা হয়েছে মোগল, তুর্কি ও পারস্যের সংমিশ্রণে। নির্মাণে ইট, বালু, সিমেন্টের পাশাপাশি চীনামাটি ও টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। উপজেলা সদর থেকে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে গুণাইঘর গ্রামে নান্দনিক মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটি দেখতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ ভিড় জমায়। অনেকে এখানে আসে জুমার নামাজ পড়তে। ২০০২ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০০৫ সালে উদ্‌বোধন হয়। সাবেক এমপি ইঞ্জিনিয়ার মনজুরুল আহসান মুন্সী মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির স্থপতি শিল্পী শাহিন মালিক। ক্যালিগ্রাফি, কারুকাজ ও নকশার শিল্পী বশির মেসবাহ। মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটিসূত্র জানান, মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট, প্রস্থ ৩৬ ফুট। সাতটি গম্বুজ, চারটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। প্রতিটি মিনারের উচ্চতা ৮০ ফুট। ভিতরে রয়েছে ঝাড়বাতি। ভিতরে শতাধিক আর বারান্দায় ২ শতাধিক মুসল্লি নামাজ পড়তে পারেন। মসজিদের সামনে আরও ৫ শতাধিক মুসল্লির নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে। মসজিদের ওপর বিভিন্ন আলোকসজ্জা রয়েছে– যা দূর থেকে নজর কাড়ে। মসজিদে লেখা 'আল্লাহ' শব্দটি রাতের বেলা জ্বলতে থাকে। মসজিদটির সঙ্গে ফুলের বাগান রয়েছে। ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য চাঁদ ও তারা আঁকা। এখানে বাংলায় আটটি ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। আরবিতে লেখা রয়েছে কোরানের চার কুল। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ৩৫০ মণ চীনামাটির টুকরো ও ২৫০টি গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদটি দেখতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসে। বিশেষ করে দূরদূরান্ত থেকে অনেক মুসল্লি জুম্মার নামাজ পড়তে আসেন।

প্রতিবেদন: ফারিহা রেজা

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত

দেশের বড়ো সড়কগুলোতে টোল আদায়ের নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বড়ো সড়কগুলোতে টোল আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ নির্দেশনা দেন

প্রধানমন্ত্রী। শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকটি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। একনেকের এ সভায় ১৬ হাজার ৯১৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয়ে সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চার লেনের সড়কটির পাশাপাশি ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে।

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটিতে ১৩ হাজার ২৪৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা ঋণ দিবে এডিবি। সভায় জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক, সি বিমসটেক করিডর, সার্ক করিডরসহ আঞ্চলিক সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। চলতি বছর কাজ শুরু করে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

উত্তরা থেকে কমলাপুর মেট্রোরেল মেগা প্রকল্প

উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ২১ কিলোমিটার। থাকবে ১৭টি স্টেশন। এর মধ্যে উত্তরা সেন্টার, বিজয় সরণি ও মতিঝিল স্টেশন হবে আইকনিক স্টেশন। বাকিগুলো সাধারণ স্টেশন। জাপানের সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন দেশের প্রথম মেট্রোরেলের এই রুটে ২৪ সেট ট্রেন চলাচল করবে। প্রতিটি ট্রেনে থাকবে ছয়টি করে কার। প্রতি চার মিনিট পরপর এক হাজার ৮০০ যাত্রী নিয়ে ১০০ কিলোমিটার গতিতে ছুটবে মেট্রোরেলটি। উভয় দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী বহনের সক্ষমতা থাকবে মেট্রোরেলের। ২২ হাজার কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের লাইন ৬ অংশটি আগামী ২০২৪ সালে শেষ হওয়ার কথা। লাইন চালু হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে ৩৮ মিনিট।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

১৩ দিনে টিকা নিলেন ২৩ লাখ মানুষ

দেশে গণটিকাদান কর্মসূচির শুরুর দিন থেকে ১৩তম দিনে অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৩ লাখ মানুষ করোনার টিকা নিয়েছেন। এই ১৩তম দিনেই টিকা নিয়েছেন সোয়া দুই লাখেরও বেশি মানুষ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এ পর্যন্ত যারা টিকা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১৫ লাখ ১৮ হাজার ৭১৫ জন পুরুষ এবং ৭ লাখ ৮৯ হাজার ৪৪২ জন নারী। উল্লেখ্য, দেশে করোনার টিকার নিবন্ধন শুরু হয় ২৭শে জানুয়ারি থেকে আর ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে গণটিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুর দিকে টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৫৫ বছরের বেশি বয়সিদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়। পরে বয়সসীমা কমিয়ে ৪০ বছর করা হলে টিকার জন্য নিবন্ধন বাড়তে থাকে। ঢাকায় বড়ো হাসপাতালের পাশাপাশি নগর মাতৃসদন কেন্দ্রগুলোতেও করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শাহবাগে বারডেম অডিটোরিয়ামে ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

আইসিইউ হবে প্রতিটি সদর হাসপাতালে

দেশের প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে ১০ শয্যার নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। কিন্তু এজন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনবলের সংকট থাকায় তা বাস্তবায়নে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। তবে এ বিষয়ে কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ১লা ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে হাইকোর্টে দাখিল করা এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

শিশুদের ক্যানসার নিরাময়যোগ্য

শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসায় গড় আয়ু কমে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। এই রোগের চিকিৎসায় শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় না। সঠিক চিকিৎসা পেলে ক্যানসার সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক শিশু ক্যানসার দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আয়োজিত এক সমাবেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউ'র উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, শিশু ক্যানসার প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি অত্যন্ত জরুরি। ২০১৯ সালে ক্যানসার আক্রান্ত ৬০ শিশু বিএসএমএমইউতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছে।

টিকা উৎপাদনে আইভিআই চুক্তিতে অনুসমর্থন

নতুন আবিষ্কৃত টিকার প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশে নতুন টিকা উৎপাদন আরো সহজ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট (আইভিআই) প্রতিষ্ঠার চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। ২২শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদন পেল অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার তৈরি করোনার টিকা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখন অক্সফোর্ড–অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকার দুটি সংস্করণই ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিতে পারবে। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার যে দুটি সংস্করণ ডব্লিউএইচও অনুমোদন দিয়েছে তার একটি উৎপাদন করছে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট। অন্যটি উৎপাদন করছে দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাস্ট্রোজেনেকা এসকেবায়ো। উল্লেখ্য, ডব্লিউএইচও জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে টিকার গুণগত মান, নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা যাচাই করে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

আগামী ৪ বছরে বার্ষিক ২৫ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করতে চায় সরকার

আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ বার্ষিক ২৫ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করতে চায় সরকার। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগে ভর করে এ কর্মসংস্থানে উৎপাদনমুখী শিল্প খাত বড়ো অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের ঘরে নামানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আর লক্ষ্যপূরণে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা জনগণের আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়ন করার তাগিদ দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান।

ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকা দারিদ্র্যের হার করোনা মহামারির থাবায় আবারো বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। তাই দারিদ্র্যের হার কমাতে কর্মসংস্থানের গতি বাড়াতে চায় সরকার। ২০২০-এর জুন থেকে কাগজে-কলমে শুরু হওয়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাই কৃষি ও সেবা খাতের তুলনায় শিল্পে রাখা হচ্ছে বাড়তি ভরসা। ২০২৫ সাল নাগাদ ৮.৫১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতি ১০০ টাকার ৩৭ টাকা বিনিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার এনইসি সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সভায় বলা হয়, ৫ বছরে বিদেশে সাড়ে ৩২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে জানান বক্তারা। পরিকল্পনায় ব্যাংক, পুঁজিবাজার ও আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণ আদায়-ব্যাংকিং আদালতের কার্যক্রমের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেন, কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি বা ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়েছে এ রকম অসহায় দরিদ্র ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত করতে তাদের জন্য প্রি-ভোকেশনাল স্কিলস ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ২৫শে ফেব্রুয়ারি খুলনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্পের আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বিষয়ক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দোহাজারী রুটে ডেমু ট্রেনের উদ্‌বোধন

দোহাজারী রেলস্টেশন চত্বরে চট্টগ্রাম-দোহাজারী ও চট্টগ্রাম-পটিয়া রুটে নতুন দুইজোড়া ডেমু ট্রেন ৬ই ফেব্রুয়ারি উদ্‌বোধন করেন রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, প্রথম পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এখানে ডেমু ট্রেন দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি মেগাপ্রকল্পের মধ্যে দুটি রেলওয়ের প্রকল্প রয়েছে।

তিনি জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের রেল যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে দোহাজারীতে একটি অত্যাধুনিক জংশন হবে। যোগাযোগের পাশাপাশি এখানে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইনের নির্মাণকাজ শেষ করে ট্রেন চলাচলের উপযোগী করা হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১৩ই ফেব্রুয়ারি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৩০শে জুন শেওলা শুল্ক

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ সিলেটে শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১-এর আওতায় শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে এ শুল্ক-স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ বন্দর দিয়ে গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছরা, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না-ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিয়াঁজ, মরিচ, রসুন, আদা আমদানিসহ সকলপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। এসময় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

তামাবিলকে আধুনিক স্থলবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তামাবিল স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে তামাবিলকে আধুনিক স্থলবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, বন্দরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার প্রস্তুত। প্রতিমন্ত্রী ১৪ই ফেব্রুয়ারি তামাবিল স্থলবন্দরে বন্দরের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলাম মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

অপারেশন সুন্দরবন চলচ্চিত্র

একঝাঁক তারকা নিয়ে এ বছরেই মুক্তি পাচ্ছে র‍্যাব নির্মিত বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র *অপারেশন সুন্দরবন*। সিনেমাটি নিয়ে এরই মধ্যে দর্শকের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে।'

অপারেশন সুন্দরবন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কীভাবে সুন্দরবনকে জলদস্যুমুক্ত করেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। দেশপ্রেম, রোমাঞ্চ, রহস্য, সাহস, দীর্ঘদিনের অপরাধের শেকড় উন্মোচন, অপরিসীম প্রতিকূল এবং রহস্যে ঘেরা বনভূমি সুন্দরবন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র *অপারেশন সুন্দরবন* চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছে র‍্যাব ওয়েলফেয়ার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড। এ সিনেমায় রিয়াজ, সিয়াম, নুসরাত ফারিয়া, তাসকিন, রোশান, কলকাতার অভিনেত্রী দর্শনাসহ আরও দেখা যাবে শতাব্দী ওয়াদুদ, মনোজ প্রামানিকদের।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৬ই মার্চ ২০২১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে মুজিব শতবর্ষ ও ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উপলক্ষে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১'-এ বক্তৃতা করেন–পিআইডি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র সুঁজুকি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, জাতিগত বৈষম্য, তাদের দুঃখ দুর্দশা, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা সুঁজুকি। নির্মাতা সোয়েব সাদিক সজীবের পরিচালনায় তার প্রথম সিনেমাটি আগামী রোজার ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় সাঁওতাল পল্লিতে হয়েছে এর শুটিং। মাহি কথাচিত্রের ব্যানারে সিনেমাটির প্রযোজনা করেছেন মুস্তাফিজুর রহমান।

সুঁজুকি চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন– একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী দিলারা জামান, শহীদুল আলম সাচ্চু, আরমান পারভেজ মুরাদ, কচি খন্দকার, কাজী রাজু, কোহিনুর আলম, কাজী লায়লা বিলকিস, সাবিনা ইয়াসমিন, লিমন, মিলনসহ প্রায় ৩০ জন সাঁওতালি শিল্পী। এ সিনেমায় গান করেছে বাংলাদেশে একমাত্র সাঁওতালি ব্যান্ড সেঙ্গেল।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকমুক্ত করতে পরীক্ষামূলক প্রকল্প

চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর অঞ্চলকে মাদকমুক্ত করতে পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ১৭ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কমিটির পঞ্চম সভা শেষে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। যাতে আরো নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভা থেকে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছি। মাদক প্রতিরোধে উপজেলা কমিটি সক্রিয় করার জন্য বলা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও দিনাজপুর জেলাকে মাদকমুক্ত করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কীভাবে এটা বাস্তবায়ন করা হবে, সেটা ঠিক করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি কার্যপরিধি, কার্যপদ্ধতি নিশ্চিত করে ব্যবস্থা নেবেন।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট

সরকারি চাকরিতে ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থায়ী কমিটির সভাপতি জানান, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন দিয়েছেন সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ডোপ টেস্ট করা হবে। ডোপ টেস্টের নীতিমালা তৈরি হচ্ছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রেও ডোপ টেস্ট করতে হবে। আমরা ব্যাপকভাবে এটা প্রচার করব। তিনি আরো বলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে, তাদের ডোপ টেস্ট করা হচ্ছে। এটা আমরা শুরু করেছি। এখনই এটা ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে না।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনাকে নিবেদিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নেয় গ্যালারি কসমস। কসমস আতেলিয়ার ৭১-এর সহায়তায় আর্ট ক্যাম্পের আয়োজন করে। সেই শিল্প-শিবিরে একুশ শিল্পীর ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয় বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার সংগ্রামী ও বর্ণিল জীবনের নানা অধ্যায়। চিত্রকরদের চিত্রপটে মূর্ত হয়– ত্যাগ ও সংগ্রামের কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে কেমন করে বর্তমানের অবস্থানে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ৭ই মার্চ ২০২১ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে 'ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস' উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। চিত্রিত হয় বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথরেখায় তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বদেশকে সমৃদ্ধির পানে এগিয়ে নেওয়ার বৃত্তান্ত। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে মালিবাগের কসমস নামের প্রদর্শনালয়টিতে শুরু হয় দুই মাসব্যাপী এ প্রদর্শনী। কূটনীতিক থেকে বোদ্ধামহলে সমাদৃত হওয়া 'শেখ হাসিনা: অন দ্য রাইট সাইড অব হিস্ট্রি' শীর্ষক এই শিল্পায়োজনের মূল বিষয়বস্তু ছিল। এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বহুমাত্রিক পরিবেশনায় ভাষা শহিদদের স্মরণ

আমার এমন মধুর বাঙলা ভাষা/ভায়ের বোনের আদর মাখা/মায়ের বুকের ভালোবাসা...। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সেই বিশেষ দিন। বাংলা বর্ণমালার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী বাংলা মায়ের দামাল ছেলের রক্তস্নাত অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। একইসঙ্গে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিনটিতে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে ভাষা শহিদদের। নানা আয়োজনে বহুমাত্রিক পরিবেশনায় স্নিগ্ধ রূপ বিরাজ করেছে রাজধানী সংস্কৃতি অঙ্গনজুড়ে। গানের সুরে, কবিতার ছন্দে, বক্তার কথায় কিংবা নাচের মুদ্রায় প্রকাশিত হয়েছে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এসব পরিবেশনায় উঠে এসেছে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে ১শ ৩৬ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের উদ্‌বোধন

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় দুই দিনের সফরে ১শ ৩৬ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশেসিং এমপি। ৩১শে জানুয়ারি বিভিন্ন কাজ উদ্‌বোধনকালে পার্বত্যমন্ত্রী পাহাড়ে চলমান উন্নয়নের বর্ণনা দিয়ে বলেন, যতদিন ক্ষমতায় আছি পাহাড়ের মানুষকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার শক্তি। তাঁর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, দেশের মানুষের কল্যাণ হচ্ছে। আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এই অর্জন বাংলাদেশের সকল মানুষের।

মাতৃভাষা পদক পেলেন মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

মাতৃভাষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথম মাতৃভাষা পদক পান মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। তিনি খাগড়াছড়ি জাবারং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক। দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার পরিস্থিতি, মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণায় ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক পান মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী মাতৃভাষা চর্চা বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিন ব্যক্তি এবং একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক' বিতরণ করেন। প্রথমবারের মতো এই পদক দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি পদকপ্রাপ্তদের হাতে পদক তুলে দেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবিমা চালু

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অর্থের অভাবে যাতে নষ্ট না হয় সে উপলক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে দেশে প্রথমবারের মতো ১লা মার্চ চালু করা হয় 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবিমা'। এই বিমা পলিসির প্রিমিয়াম দিতে হবে বছরে ৮৫ টাকা। পলিসির মেয়াদের মধ্যে বিমাগ্রহিতা মারা গেলে বা শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়লে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তার সন্তানকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র জাতীয় বিমা দিবসের অনুষ্ঠানে এই বিমা পলিসির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন।

বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)-এর সূত্রে জানা যায়, প্রতি জেলা থেকে একটি করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা (দশম শ্রেণি পর্যন্ত) বেছে নেওয়া হচ্ছে। ৩-১৭ বছর বয়সি শিক্ষার্থীরা হবে এই বিমা পলিসির সুবিধাভোগী। পলিসি করা মা, বাবা অথবা অভিভাবকদের বয়স হতে হবে ২৫-৬৪ বছর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ১লা মার্চ ২০২১ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বিমা দিবস ২০২১'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবিমা' সনদ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে অংশ নেন–পিআইডি

আপাতত ৭০ হাজার শিক্ষার্থীর বাবা, মা বা অভিভাবকদের বিমা পলিসির আওতায় আনা হবে।

এক বছর পর ৩০শে মার্চ খুলবে স্কুল-কলেজ

করোনা মহামারির কারণে এক বছর ধরে বন্ধ থাকা স্কুল-কলেজ ৩০শে মার্চ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এরও দুই মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা বলা হয়েছে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হলেও শুরুতে প্রতিদিন সব শ্রেণির পাঠদান হবে না। প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের দ্বাদশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে দশম এবং প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন (সপ্তাহে ৬ দিন) ক্লাস হবে। এছাড়া প্রথমদিকে বাকি শ্রেণিগুলো শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন ক্লাস হবে। নবম ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাস হবে। করোনা পরিস্থিতির আরো উন্নতি হলে স্বাভাবিক ক্লাস শুরু হবে। আর প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাস আপাতত বন্ধই থাকছে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীরা টিকায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকে করোনাভাইরাসের টিকা যাতে দেওয়া যায়, সেজন্য নির্দেশনা দেওয়া আছে। এজন্য জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেখানে সহযোগিতা করছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে টিকা নেওয়ার পর গণমাধ্যমে একথা জানান তিনি। এসময় মন্ত্রী বলেন, যেহেতু এই টিকা নিতেই হবে, এটার কোনো বিকল্প নেই, তাই নিয়ে নেওয়াই ভালো। তিনি সবাইকে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে এই টিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় ও নির্দেশনায় সারা দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকারমূলক টিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন প্রতিবন্ধীদের

বাগেরহাট-৪ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমিরুল আলম মিলন বলেন, আমাদের মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন। প্রতিবন্ধীদেরকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বাংলাদেশের অটিজম নিয়ে কাজ করছেন। তার প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধীদের টেকসই জীবনমান উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়। তাদের প্রতি আমাদের সবার সমান দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং তাদের জন্য একীভূত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রকল্পের এক অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমিরুল আলম মিলন এসব কথা বলেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে এমপি মিলন বলেন, দেশের ১০৩টি কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ফিজিও-থেরাপির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। চাকরির কোটা করে সার্ভিস পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। ১০ লাখ প্রতিবন্ধী মাসিক ৭০০ টাকা করে সহায়তা পাচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় লেখাপড়ার শেখানোর জন্য প্রতিটি উপজেলা একটি করে প্রতিবন্ধী স্কুল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্তা পানির আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যয় করাসহ বহু প্রকল্প

বাস্তবায়ন করছে প্রতিবন্ধীবান্ধব এই সরকার।

বঙ্গবন্ধু সাংবিধানিকভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, সমাজের পিছিয়ে

পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে না আনলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। ৭ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ইশারা ভাষা দিবস-২০২১' উপলক্ষে আলোচনাসভায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিছুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের বাজেট ২০ কোটি টাকা

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের জন্য ২০ কোটি টাকার বাজেট পাশ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবারের আয়োজনের নাম করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০'। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সাংগঠনিক কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এই বাজেট পাশ করা হয়। আগামী পহেলা এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে দেশের সর্ববৃহৎ এই ক্রীড়াযজ্ঞ চলবে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত। খেলোয়াড়, টিম অফিসিয়াল ও খেলা পরিচালনার জন্য টেকনিক্যাল অফিসিয়ালসহ আনুমানিক ৮ হাজার ৫০০ জন অংশগ্রহণ করবেন এতে।

ইনিংস ব্যবধানে জিতল বাংলাদেশ 'এ'

জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ম্যাচে ঘূর্ণির মায়াজালে বাংলাদেশ বিধ্বস্ত করেছেন সফরকারী আয়ারল্যান্ড ওলভসের ব্যাটসম্যানদের। তানভীর ইসলামের ঘূর্ণিতে চার দিনের ম্যাচ আড়াইদিনেই জিতেছে ইনিংস ও ২৩ রানে। তানভীর তার ক্যারিয়ারের ১২ নম্বর ম্যাচে প্রথমবারের মতো ১০ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে তিনি ১৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ সংগ্রহ করে ৩১৩ রান। জবাবে আয়ারল্যান্ড ব্যাট করতে নেমে সবকটি উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে করে ১৫১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে করে ১৩৯ রান। ফলে ইনিংস ও ২৩ রানে ম্যাচ জিতে বাংলাদেশ 'এ' দল।

ঢাকার বাইরেও বাংলাদেশ গেমস

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে ঢাকার বাইরে নয়টি ডিসিপ্লিনের খেলা হবে। গেমসে মোট ৩১টি ডিসিপ্লিন। আগে সাতটি ভেন্যু ছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি আরও দুটি নতুন ভেন্যু যোগ করা হয়েছে সাংগঠনিক কমিটির সভায়। এর মধ্যে গাজীপুরের টঙ্গীর শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে আরচারি এবং কুমিল্লায় হবে ব্যাডমিন্টন। ভার্চুয়াল সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, বিওএ সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, সাভার নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসিসহ সাংগঠনিক কমিটির কর্মকর্তারা যুক্ত ছিলেন। নারীদের ক্রিকেট সিলেটে, পুরুষদের ক্রিকেট বরিশালে, কারাতে বান্দরবানে, রাগবি রংপুরে, টেনিস রাজশাহীতে, ভলিবল নড়াইলে এবং ভারোত্তোলন ময়মনসিংহে হবে।

র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি তামিম-তাইজুলদের

ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তামিম, তাইজুলরা। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ৩৭ নম্বরে উঠে এসেছেন তামিম ইকবাল। লিটন দাস (৫৪) এগিয়েছেন ১১ ধাপ। বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ২২ নম্বরে উঠে এসেছেন তাইজুল ইসলাম। ঢাকা টেস্টে আট উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার। এছাড়া অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে ১১ নম্বরে উঠেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। আগের মতোই চারে আছেন সাকিব আল হাসান।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান চলে গেলেন না ফেরার দেশে

আফরোজা রুমা

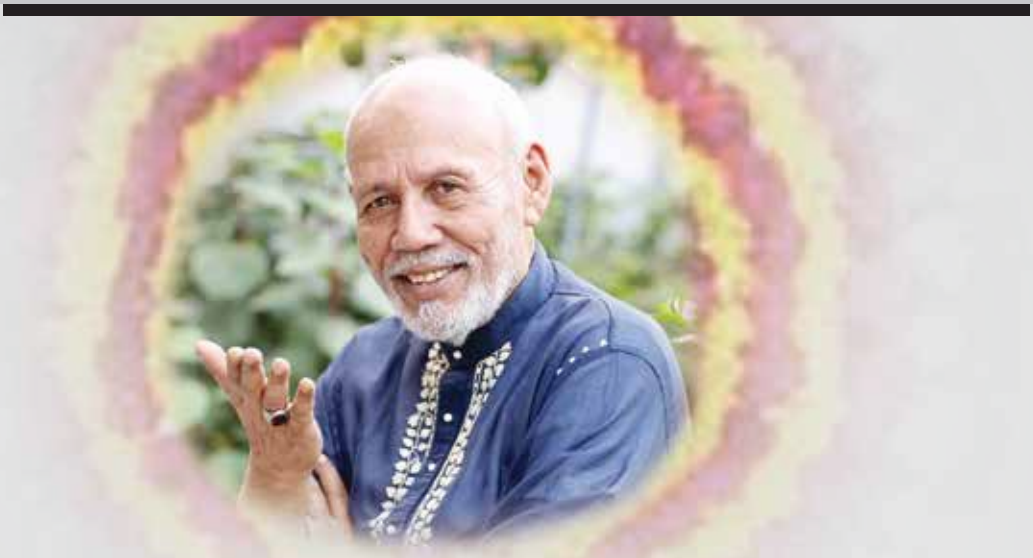

একুশে পদকে ভূষিত বর্ষীয়ান অভিনয়শিল্পী এটিএম শামসুজ্জামান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সূত্রাপুরের দেবেন্দ্রনাথ লেনের নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। দীর্ঘদিন তিনি শ্বাসকষ্টসহ নানা বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

১৯৪১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এটিএম শামসুজ্জামান। গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের ভোলাকোটের বড়বাড়ী। তাঁর বাবা নূরুজ্জামান ছিলেন নামকরা উকিল এবং শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে রাজনীতি করতেন। মা নুরুন্নেসা বেগম। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে এটিএম শামসুজ্জামান সবার বড়ো। পড়াশোনা করেছেন ঢাকার পগোজ স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহীর লোকনাথ হাইস্কুলে। অভিনয়শিল্পী এটিএম শামসুজ্জামান হিসেবে সমাধিক পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। সহকারী পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর *মানুষের ভগবান* ও *বিষকন্যা* ছবিতে। ১৯৬৫ সালে চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য লেখা শুরুর পর তিনি শতাধিক চিত্রনাট্য ও কাহিনি রচনা করেন। ওই বছরই নির্মাতা নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত এতটুকু আশা ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে অভিষেক ঘটে। ১৯৭৬ সালে আমজাদ হোসেনের *নয়নমণি* ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে আলোচনার পাদপ্রদীপে আসেন বর্ষীয়ান এ অভিনেতা। তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে ও কয়েকশ টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।

তিনি *ম্যাডাম ফুলি* (১৯৯৯) ও *চুড়িওয়ালা* (২০০১) চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৫ সালে তিনি জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে* উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একই নামের চলচ্চিত্রে মকবুল চরিত্রে অভিনয় করেন। এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। একই বছর তিনি তাঁর নিজের লেখা কাহিনিতে সালাউদ্দিন লাভলুর পরিচালনায় অভিষেক চলচ্চিত্র *মোল্লা বাড়ীর বউ*-এ গাজী এবাদত মোল্লা চরিত্রে অভিনয় করেন। এই কাজের জন্য তিনি তারকা জরিপে সেরা চলচ্চিত্র অভিনেতা বিভাগে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়া তিনি *মন বসে না পড়ার টেবিলে* (২০০৯) চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা বিভাগে চতুর্থ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৯ সালে শাবনূর-রিয়াজ জুটির *এবাদত* ছবি দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অভিষেক ঘটে। তিনি সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাস অবলম্বনে নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্মিত *গেরিলা* (২০১১) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ১৪তম মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারে একটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি রেদওয়ান রনির পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *চোরাবালি*-এ অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন। ৪২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন তিনি।

বর্ষীয়ান চলচ্চিত্রকার এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০শে ফেব্রুয়ারি বাদ জোহর নারিন্দা পীর সাহেব বাড়ি মসজিদে প্রথম নামাজে জানাজা শেষে সূত্রাপুর কমিউনিটি সেন্টারে লাশ রাখা হয় সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সূত্রাপুর মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে বাদ আসর জুরাইন কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 09, March 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd